

ମାତ୍ରମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜୀବନଯାତ୍ରା ଓ ସୃଂକ୍ଷଣି ଦୁଲତାନ୍ତି ମୁଶଳ ମୁଗ



৭.১ জীবনযাত্রা

সুলতান, বাদশাহ, রাজা-উজিররা দেশ শাসন করেন। তাঁদের কথা লেখা থাকে নানা বইতে। কিন্তু, দেশের অগণিত সাধারণ গরিব মানুষের কথা বিশেষ কিছু বলা থাকে না। অথচ সেই গরিব জনগণের চাষ-বাস, শিল্প থেকে যে টাকা আয় হয় তাতে রাজা-বাদশাহের শাসন চলে। তাহলে দেখা যেতে পারে কেমন ছিল সাধারণ মানুষের জীবন সুলতানি এবং মুঘল যুগে।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ থামেই বাস করতেন। স্থানীয় চাহিদা মেটানোই ছিল চায়ের প্রধান কাজ। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তুলনায় বড়ো শিল্প দেখা যেত। কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধার জন্য নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি করা হতো। বাংলা এবং গুজরাটে এই সুবিধা থাকায় সেখানে শিল্পাঞ্চল ছিল। দেশের শাসকরা চাষির ফসলের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাত। তার বদলে সাধারণ লোকের শাস্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দিত প্রশাসন।

ଗାଙ୍ଗେଯ ସମ୍ଭୂତିତେ ଉପରେ ଫସଲେର ମଧ୍ୟେ ଆମେର ସବଚେଯେ ବେଶି ଚାହିଦା ଛିଲ । ଆୟୁର, ଖେଜୁର, ଜାମ, କଳା, କାଠାଳ, ନାରକେଳ ପ୍ରଭୃତି ଫଳେରେ ଚାଷ ହତୋ । ନାନା ରକମ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନକାଠ, ଘୃତକୁମାରୀ ଏବଂ ନାନା ଭେଷଜ ଉନ୍ନିଦ ଭାରତେ ହତୋ । ଲଞ୍ଜା, ଆଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଶଳାଓ ଚାଷ ହତୋ । ଆର ଛିଲ ନାନାନ ଗୃହପାଲିତ ପଶ୍ଚାତ୍ତି ।

କୃଷି-ପଣ୍ଡକେ ଭିତ୍ତି କରେ ଗ୍ରାମେ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ଚଲତ । ଚିନି ଏବଂ ନାନାମୁଦ୍ରାଧରୀ ଆତର ତୈରିର ଶିଳ୍ପ ଛିଲ ବିଖ୍ୟାତ । ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଣି ବଂଶଗତ ଛିଲ । ତାଇ ପରୋନୋ ସମ୍ପ୍ରଦାଯିତା ବ୍ୟବହାର କରେଣେ ଶିଳ୍ପଦ୍ରବ୍ୟଗଲିର ମାନ ହତୋ ଅସାଧାରଣ ।

এই সময়ে চালু শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুর কাজ, পাথরের কাজ, কাগজ শিল্প প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজমিস্ত্রি এবং পাথরের কাজে পটু কারিগরদের চাহিদা ছিল সর্বত্র। টালি ও ইটের ব্যবহার করে বাড়ি বানানোর পদ্ধতি চালু হয়েছিল বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে।

রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সবসময়ে সমান ছিল না। দেশে দভিক্ষ বা ঘন্থ লাগলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ত। আবার জিনিসপত্রের খব



୧୧୨ ନଂ ପୃଷ୍ଠାର ଛବିଗୁଲି
ଭାଲୋ କରେ ଦେଖୋ ।
ଛବିଗୁଲିତେ କାରା କୀ କୀ
କାଜ କରଛେ ?

ঠিক্কি ও প্রতিক্রিয়া

কম দামের নজির ছিল ইবাহিম লোদির রাজত্বকাল। একটা বহলোলি মুদ্রা (সুলতান বহলোল লোদির আমলে চালু) দিয়ে লোকে দশ মণ খাদ্যশস্য, পাঁচ সের তেল এবং দশ গজ মোটা কাপড় কিনতে পারত।



আলাউদ্দিন খলজি এবং
মহম্মদ বিন তুঘলকের
সময়ে পণ্ডিতব্যের দামের
তুলনা করলে কি কোনো
তফাত দেখা যাবে?

চুক্রে কথা

প্রতি মাঘের দাম জিতলের টিক্কারে

| পণ্ডিতব্য | আলাউদ্দিন খলজি | মহম্মদ বিন তুঘলক | ফিরোজ শাহ তুঘলক |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| গম | ৭½ | ১২ | ৮ |
| ঘব | ৮ | ৮ | ৮ |
| ধান | ৫ | ১৪ | — |
| ডাল | ৫ | — | ৮ |
| মসুর | ৩ | ৮ | ৮ |
| চিনি | ১০০ | ৮০ | — |
| ভেড়ার মাংস | ১০ | ৬৪ | — |
| ঘি | ১৬ | — | ১০০ |

শোনা যায় মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে বাংলায় নাকি জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সন্তোষ। ইবন বতুতা বাংলায় জিনিসপত্রের দামের একটা তালিকা দিয়েছেন—

| | |
|--------------------------------|---------|
| একটি মুরগি | ১ জিতল |
| পনেরোটি পায়রা | ৮ জিতল |
| একটি ভেড়া | ১৬ জিতল |
| তিরিশ হাত লম্বা খুব ভালো কাপড় | ২ তঙ্কা |
| চাল (প্রতি মণ) | ৮ জিতল |
| একটি ছাগল | ৩ তঙ্কা |
| চিনি (প্রতি মণ) | ৩২ জিতল |

সমাজ ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। সমাজে এবং পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীর স্থান ছিল নীচে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে ঘোমটা এবং পর্দার প্রচলন ছিল। কিন্তু গরিব কৃষক পরিবারে, নারী-পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার এবং খামারে পরিশ্রম করতে হতো। সেই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের পর্দা বা ঘোমটার বিশেষ প্রচলন ছিল না।

সাধারণ গরিব জনগণের বসতির জন্য সামান্য কিছু উপকরণ লাগত। একটা পাতকুয়া, ডোবা বা পুকুর থাকলেই বসতি তৈরি করে নিতে পারত প্রামের মানুষ। ঘর তোলার জন্য কয়েকটি গাছের গুঁড়ি, চাল ছাইবার জন্য কিছু খড়। এতেই তারা মাথা গোঁজবার ঠাই করে নিত।

সরকারি খাজনা ও নানা পাওনা মিটিয়ে ফসলের কিছু অংশ কৃষকের হাতে থাকত। সেটাই ছিল রোজকার ব্যবহারের সম্বল। বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষক পরিবারগুলি দিন-রাত পরিশ্রম করত। কৃষকের দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে অল্প তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ের একজন ওলন্দাজ বণিক লিখেছেন যে, গরিবরা মাংসের স্বাদ প্রায় জানতই না। তাদের রোজের খাবার ছিল একঘেয়ে খিচুড়ি। তাই দিয়েই সারাদিনে একবার মাত্র বিকেলবেলায় তারা খালি পেট ভরাত। পরবার পোশাকও যথেষ্ট ছিল না। একজোড়া খাটিয়া ও রান্নার দু-একখানা বাসনই ছিল তাদের ঘর-গৃহস্থালি। বিছানার চাদর ছিল একটি বা বড়ো জোর দুটি। তাই তারা পেতে শুতো, দরকারে গায়ে দিত। গরমের দিনে তা যথেষ্ট হলেও দারুণ শীতে তাদের ভীষণই কষ্ট হতো। পালা-পার্বণে আনন্দ-উৎসব ছিল একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে ভেবে দেখো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাদের অভিজাতরা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও তাজমহলের মতো স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তারা বিপুল অর্থ খরচ করতেন। দামি পোশাক, অলংকার, নানা রকম বিলাস দ্রব্যের জন্য টাকা খরচ করতে তারা দু-বার ভাবতেন না।

সে যুগের খেলাধুলোর মধ্যে কুস্তি ছিল একটি জনপ্রিয় খেলা। অভিজাত, সাধারণ জনগণ এমনকী সাধু-সন্তরাও কুস্তির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তির-ধনুক, বর্ণা ছোঁড়া ও সাঁতার জনপ্রিয় ছিল। বাংলায় বাঁটুল ছোঁড়া নামের একরকম খেলার কথা জানা যায়। লোকগান, নাচ, বাজিকর বা জাদুকরের খেলা, সং প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের আনন্দের উপকরণ।

দিল্লিতে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে শাসকের বদল ঘটেছে নানা সময়ে। কিন্তু, সুলতানি ও মুঘল যুগে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় একই রয়ে গেছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অভাবের সংসার — সেযুগে ভারতের গরিব কৃষক, কারিগর, শ্রমিকের জীবন বলতে এটুকুই।

টুকরো কথা

প্রেসালেং জমিয় মাদা

দিন-রাতের সময় বোঝার জন্য সমস্ত দিন-রাত কে আটটি ‘প্রহর’ (ফারসিতে ‘পাস’)-এ ভাগ করা হতো। একেকটি প্রহর আজকের হিসাবে প্রায় তিনঘণ্টা। আটটি প্রহর আবার যাটটি ‘ঘড়ি’তে (ঘটিকা) বিভক্ত ছিল। এক ঘড়ি সমান আজকের চারিশ মিনিট। প্রতিটি ঘড়ি আবার যাটটি ‘পল’-এ ভাগ করা ছিল। এইভাবে দিনরাত্রি মিলিয়ে হতো তিনহাজার ছশো পল। প্রহর ও ঘড়ির যথাযথ সময় বুবো নেওয়া যেত পাঁজির সাহায্যে। জলঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করা হতো। প্রধান শহরগুলিতে ঘন্টার আওয়াজ করে সময় কতো হলো তা জানান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তু ঘলকের আমলে এই কাজের জন্য আলাদা একটা দফতরই ছিল।

এর খেকে তুমি সেযুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী ধারণা করতে পারো?

ଜୀବନ-ଜୀବିକାର ନାମ ରକମ : ଦୁଲତ୍ତାନି ଡେ ମୁହଲ ଯୁଗ



৭.২ নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: ভক্তি ও সুফিবাদ

মধ্যযুগের ভারতে জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ধর্ম। ভারতে সুলতানি আমলে ধর্ম নিয়ে নতুন কিছু ভাবনার কথা শোনা যায়। পুরোনো আমলের ব্রাহ্মণবাদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তখনও কায়েম ছিল। কিন্তু মানুষের মনের উপরে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এই অবস্থায় ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের কথা শোনা যেতে থাকে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের উপর এই ধর্মপ্রচারকরা জোর দেন। এইরকমের চিন্তাধারা ছিল প্রথাগত ধর্মত্বের একেবারে বাইরে।

ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসা বা ভক্তি। এই ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হলো ভগবানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। অন্যটি হলো ঈশ্বরলাভের জন্য জ্ঞান বা যোগ ছেড়ে ভক্তের ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রথমে দক্ষিণ ভারত এবং পরে উত্তর ভারতের ভক্তিবাদের মূল কথা হয়ে ওঠে।

ভক্তিবাদের উৎপন্নের কারণ কী ছিল? খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের পতনের পরে কয়েকজন রাজপুত রাজা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এদের সমর্থন করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। তখন রাজপুত এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রাহ্মণ ধর্মের বাইরে নতুন কোনো ধর্মভাবনা তখনকার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। তবে সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু মানুষ ভক্তি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাথপন্থী, ঘোগী ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীরা এর প্রমাণ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিতি পেয়েছিল দক্ষিণ ভারতের অলভার এবং নায়নার (বহুবচনে নায়নমার) সাধকরা। উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এই সাধকদের হাত ধরেই ভক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই সময় ব্রাহ্মণধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম মানুষের জীবনে অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ এই ধর্মতত্ত্বগুলি অযথা রীতিনীতির উপর জোর দিত বা চূড়ান্তভাবে অ-সাংসারিক জীবনযাপন করতে বলত। এতে না ছিল মানুষের আবেগের জায়গা, না ভালো থাকার চাবিকাঠি।

এরকম অবস্থায় সরল, সোজা তামিল ভাষায় নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জানায় অলভার এবং নায়নার সাধকরা। এতে আকৃষ্ট হয় সাধারণ

মনে রেখো

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে
উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণেরা
বিভিন্নভাবে সমাজের
অন্যান্য শ্রেণিদের
সামাজিক ও ধর্মীয়
অধিকারের উপর নানা
নিষেধ আরোপ করত।
অবাহাগদের না ছিল পবিত্র
ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠের স্বাধীনতা,
না সমানভাবে মন্দিরে
যাওয়ার অধিকার। অন্য
জাতি বা বর্গের মধ্যে
একসঙ্গে খাওয়া বা বিয়ে
করাও নিষিদ্ধ ছিল।

মানুষ। ক্রমে অবশ্য দক্ষিণের এই ভক্তিবাদও বাইরের রীতিনীতি এবং দেবতাপুজোকে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলে তারাও মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। দক্ষিণের ভক্তিবাদ কখনোই সমাজে ব্রাহ্মণদের গুরুত্বকে খাটো করার ক্ষমতা রাখত না।

ঞিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তুর্কিরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। তাদের কাছে হেরে যাওয়ায় রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা কমে আসে। তার সঙ্গেই কমে যায় তখনকার সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের দাপট। খিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। ভারতবর্ষের নানাদিকে শোনা যেতে থাকে তাঁদের কথা, লেখা, কবিতা এবং গান।

টুকরো কথা

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ)



গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের মধ্যে অন্যতম। কোনোরকম ভেদাভেদ না মেনে সমস্ত মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই চালু হয় লঙ্ঘনখানা। সেখানে এক সঙ্গে সব ধরনের মানুষেরাই থেকে বসতো। এটি শিখ গুরুদ্বারে বা ধর্মীয় স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। নানক নিজে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তবে তাঁর দর্শন এবং বাণীর উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে গড়ে উঠে শিখ ধর্ম। এই ধর্মে দশজন গুরুর কথা বলা রয়েছে যাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন গুরু নানক। এঁদের বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে। তার নাম গুরুগ্রন্থসাহিব। এটি গুরমুখি লিপিতে লেখা।

তবে এই সাধকদের ভক্তিচিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এঁদের সবার ভক্তি দর্শনের মূল কথা ছিল দুটি। একটি হলো কোনো ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হলো সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মতো করে পাওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন সাধিকা মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৮খ্রঃ)। খিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে রাজস্থানের একটি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম ও মেওয়াড়ের শাসককুলে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তাঁর সাধিকা জীবনের অনেকটা সময়েই কাটিয়েছিলেন গুজরাটের দ্বারকায়। তিনি কখনোই সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকেননি। মীরাবাঈ তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতে।

মীরাবাঈ রচিত পাঁচশোরও বেশী ভক্তিগীতি ভারতীয় সংগীত এবং
সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তেমনই একটি ভক্তিগীতি হলো—

‘মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরা না কোই,
যাকে শির মোর মুকুট
মেরে পতি সোই...’

—আমার প্রভু গিরিধর গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। যাঁর শিরে (মাথায়)
ময়ুরের পাখার মুকুট তিনিই যে আমার পতি।

মীরাবাঈয়ের উদাহরণ থেকে তোমরা কিন্তু ভেবে বসো না যে, তখনকার
ভক্তিবাদে কেবল তথাকথিত উঁচুজাতের মানুষরাই বিশ্বাস করত। সাধকদের
মধ্যে অনেকেই ছিলেন তথাকথিত নীচুজাতির। যেমন, সন্ত রামানন্দের
শিষ্যদের মধ্যে ছিল জাতিতে চামার রবিদাস, নাপিত সাই বা কসাই সাধনা।



ছবি ৭.২ : মীরাবাঈ

টুকরো কথা

কবীর (১৫৪০-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)

বারাণসীতে এক মুসলিম জোলাহা (তাঁতি) পরিবারে পালিত হন কবীর।
তিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-বোড়শ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক।
কেউ কেউ মনে করেন যে কবীর ছিলেন রামানন্দের একজন শিষ্য।
ইসলামের একেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব, নাথ-যোগী এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসও
এসে মিশেছিল কবীরের ভক্তিচিন্তায়। তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল এক, সব
ভগবানই সমান। তাই কবীরের মতে রাম, হরি, গোবিন্দ, আঙ্গাহ, সাঁই,
সাহিব ইত্যাদি ছিল এক সৌন্দরেরই বিভিন্ন নাম। কবীর বিশ্বাস করতেন যে,
মানুষ তার ভক্তি দিয়ে নিজের মনেই সৌন্দর খুঁজে পাবে। তার জন্য
মন্দিরে-মসজিদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই মূর্তি পুজো বা
গঙ্গামান বা নামাজ পড়া তাঁর কাছে ছিল অথর্থীন। তখনকার সামাজিক
জীবনে কবীরের ভাবনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর গান এবং দোহা শুনলে
বোঝা যায় তিনি ধর্মের লোক-দেখানো আচারের বিরোধী ছিলেন।

হিন্দি ভাষায় দুই পঞ্জির কবিতাকে বলে দোহা। কবীরের একটি দোহা হলো :

‘জৈসে তিল মেঁ তেল হ্যায়
জিয়ু চকমক মেঁ আগ
তেরা সাঁই তুবা মেঁ হ্যায়,
তু জাগ সকে তো জাগ...’



ছবি ৭.৩ : কবীর



ଛତ୍ରିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠ



ଗୁରୁନାନକ ଓ କବୀରେ
କଥା ସାଧାରଣ ମାନୁଷ
ସହଜେ ବୁଝାତେ
ପାରନେନ । ଏର ପିଛନେ
କୀ କୀ କାରଣ ଛିଲ ବଲେ
ତୋମାର ମନେ ହୟ ?

ଶ୍ରୀ ୭.୫ :

ଗୁରୁ ନାନକ ଏବଂ କବୀରେ
ମଧ୍ୟେ କାନ୍ତିକ ଆଲାପେର
ଦୃଶ୍ୟ । ଏର ଥେକେ ବୋାଧ ଯାଇ
ଯେ ଶିଖରୀ ସନ୍ତ କବୀରକେ
ଶ୍ରଦ୍ଧା କରତ ।

—ତିଳେର ମଧ୍ୟେ ଯେମନ ତେଲ ଆଛେ, ଚକମକି ପାଥରେର ମଧ୍ୟେ ଯେମନ ଆଛେ ଆଗୁନ, ତେମନି ତୋର ଭଗବାନ (ସାଁଇ) ତୋର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ । ଯଦି କ୍ଷମତା ଥାକେ ତୋ ଜେଗେ ଓଠ ।

ପାଁଚଶୋରାତ୍ର ବେଶି କବୀରେର ଦୋହା ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥସାହିବେର ଅଂଶ । ଶିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମର ମାନୁଷେର କାହେ କବୀରେର ଆସନ ଦଶଜନ ଶିଖଗୁରୁର ପାଶେଇ । କବୀରେର ଦୋହାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଈଶ୍ୱରକେ ପାଓଯାର କଥା ଶୁନତ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ । କାରଖାନାର ମଜୁର, ଚାସି, ଗ୍ରାମେର ମୋଡ଼ଲ — ସବାର ମୁଖେର ଭାଷାଇ ଛିଲ ଦୋହାର ଭାଷା ।

ଲୋକମୁଖେ ଶୋନା ଯାଇ ଯେ, କବୀରେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାଁର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଭକ୍ତରା କବୀରକେ ହିନ୍ଦୁ ମତେ ଦାହ କରା ହବେ ନା କି ଇସଲାମୀୟ ମତେ ଗୋର ଦେଓଯା ହବେ ତା ନିଯେ ଚିନ୍ତାଯ ପଡ଼େ । ସେ ସମୟ କବୀରେର ଦେହ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୟ । ଦେଇ ଜାଯଗାଯ ପାଓଯା ଯାଇ ସାଦା କାପଡ଼େର ଉପର ଏକ ମୁଠୋ ଲାଲ ଗୋଲାପ । ଏଇ ଫୁଲ ଦୁଇ ସମ୍ପଦାଯେର ଭକ୍ତରା ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଗ କରେ ନେଯ । ଗଙ୍ଗେର ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା ବିଚାର ନା କରେଓ ଆମରା ବୁଝି କିଭାବେ ତଥନକାର ମାନୁଷେର ମନେ କବୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ୟେର ପ୍ରତୀକ ହୟେ ଉଠେଛିଲେନ ।



ସୁଫିବାଦ

ନିଜେର ମତୋ କରେ ଭଗବାନକେ ଡାକାର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ମାନୁଷଦେର ବା ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଯାଦେର ମଧ୍ୟେଇ ସୀମିତ ଛିଲ ନା । ଶ୍ରୀମତୀ ଦଶମ-ଏକାଦଶ ଶତକ ଥେକେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଆଇନ କାନୁନେର ବାହିରେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ଈଶ୍ୱରକେ ନିଜେର ମତୋ କରେ ଆରାଧନା କରାର ପଥ ଖୁଁଜିଲେନ । ସୁଫିସନ୍ତରା ତାଦେରକେ ଏଇ ପଥ ଦେଖାଯ ।

সুফিদের আবিভাব মধ্য এশিয়ায়। আন্দাজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে তাঁরা ভারতে আসতে থাকে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে সুফিবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, সুফি কথাটি আসে সুফ থেকে যার অর্থ আরবিতে পশমের তৈরি এক টুকরো কাপড়। বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম কম্বল জাতীয় জিনিস গায়ে দিতেন সুফি সাধকরা, খ্রিস্টান সন্তরা এবং সন্ন্যাসীরা।

ভারতের মাটিতে সুফিবাদ যখন দানা বাঁধছিল সে সময়ে ভক্তিবাদ ছাড়াও নাথপন্থী ও যোগীরা তাদের ধর্ম প্রচার করেছিল। এই সবকটিই তখনকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির আচারসর্বস্তার বিরুদ্ধে ছিল। তাই আন্দাজ করা যায় যে সুফি, ভক্তি এবং নাথপন্থী ধর্মীয় ধারণা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন মনে করা হয়, সুফিরা যে হঠযোগ অভ্যাস করত, তা তারা জেনেছিল নাথপন্থীদের কাছ থেকে। এ দেশে মূলত দুটি গোষ্ঠীর সুফিরা ছিল প্রভাবশালী। দিল্লি ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে চিশতি এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুহরাবদ্দিরা। ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহেন্দ্রিদিন চিশতি। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া বা বখতিয়ার কাকি ছিলেন এই গোষ্ঠী বা সিলসিলার অন্যতম সাধক। চিশতি সুফিদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন না।

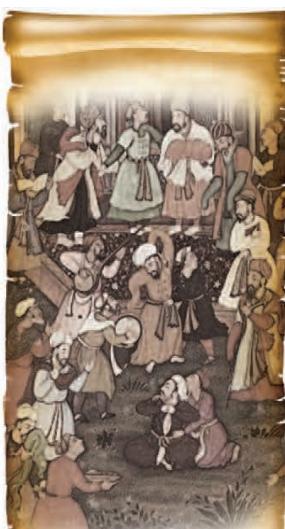
ঢর্ব ৭.৫ : সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির দ্বরগা, ফতেহপুর সিকরি, উত্তরপ্রদেশ।



টুকরো কথা

সিন্ধ ও মুরিদ

অনান্য বেশ কয়েকটি সহজিয়া ধারার মতো সুফিও ছিল একটি সাধন ধারা। সুফি সিলসিলাগুলির প্রধান ব্যক্তি হতেন কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ সাধক। তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে থাকতেন ‘খানকা’য় বা আশ্রমে। সুফি ধারায় পির বা গুরু এবং মুরিদ অর্থাৎ শিষ্যের সম্পর্ক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিররা তাঁদের ধর্মভাবনা ও দর্শন দিয়ে যেতেন বেছে নেওয়া খলিফা বা উত্তরাধি-কারীদের। সেটাই ছিল নিয়ম।



ষ্টৰ ৭.৬ :
দ্বৰবেশ সাধকৰা সাধনাৰ
জন্য একসঙ্গে জমায়েত
হয়েছো।

টুকৱো কথা

বা-শৱা ও বে-শৱা

সুফিৱা ছিল প্ৰধানত দুই প্ৰকাৰেৰ। ‘বা-শৱা’ অৰ্থাৎ যারা ইসলামীয় আইন (শৱা) মেনে চলত। এবং ‘বে-শৱা’— অৰ্থাৎ সেই সুফিৱা যারা এই আইন মানতো না। ভাৱতে দুই মতাদৰ্শৰই সুফিৱা ছিল। যায়াবৰ সুফি সম্প্ৰদায় কালানন্দাৰ ছিল বে-শৱা। চিশতি এবং সুহৰাবদ্দিৱা ছিল বা-শৱা।

টুকৱো কথা

জুফিদেৱ জনপিঘণ্টা

সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়াৰ কাকি দিল্লিতে চিশতি মতবাদকে জনপ্ৰিয় কৰে তুলেছিলেন। এতে রেগে যায় গোঁড়া উলেমাৰ দল এবং সুহৰাবদ্দিৱা। কাকিৰ বিৰুদ্ধে আভিযোগ আলা হয় যে তিনি অ-ইসলামীয় আচাৱ-আচৱণ কৱেন। যেমন, তিনি ‘সমা’ বা সুফি ‘কীৰ্তন’ গান কৱেন। এৱে প্ৰতিবাদে বখতিয়াৰ কাকি যখন দিল্লি ছেড়ে শহৱেৰ বাইৱে বেৱোন, তখন নাকি হাজাৰ হাজাৰ মানুষ তাঁৰ সঙ্গে বহুদূৰ চলে আসেন। এই দেখে বখতিয়াৰ কাকি দিল্লি ফেৱাৰ সিদ্ধান্ত নেন।

চিশতি সুফিৱা রাজনীতি এবং রাজদৰবাৰ থেকে নিজেদেৱ সৱিয়ে রাখত। তাদেৱ বিশ্বাস ছিল যে, রাজ্য পৱিচালনাৰ কাজে জড়িয়ে পড়লে কোনোভাবেই ঈশ্বৰসাধনা সম্ভৱ নয়। অন্যদিকে সুহৰাবদ্দি সুফিৱা অনেকেই দারিদ্ৰ্যেৰ বদলে আৱামেৰ জীৱন বেছে নিয়েছিল। সুলতানেৰ কাছ থেকে উপহাৰ বা সাহায্য নিতে বা রাজ্য ধৰ্মীয় উচ্চপদ প্ৰহণ কৱতে সুহৰাবদ্দিৱেৰ কোনো সংকোচ হতো না। সুহৰাবদ্দি সম্প্ৰদায়েৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বদৱউদ্দিন জাকারিয়া এক সময় সুলতান ইলতুংমিশেৰ পক্ষ নেন।

তবে চিশতি হোক বা সুহৰাবদ্দি, মধ্যযুগেৰ ভাৱতীয় সমাজে এই সব সুফি সাধকদেৱ অবদান ছিল প্ৰচুৰ। নিজেদেৱ খোলামেলা জীৱন এবং শান্তিৰ বাণীৰ মধ্য দিয়ে তাৱা সৰ্বদা চেষ্টা কৱতেন সব মানুষকে এক সঙ্গে রাখতে। সুলতানি শাসনে বাস কৱা অ-মুসলমান মানুষৱা সুফিৱেৰ এৱকম মানবদৰদী কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন। সহজিয়া ধৰ্ম (এ সম্পর্কে তোমৱা আগে পড়েছো), ভক্তি, সুফি এবং আৱো কিছু ধৰ্মত তখনকাৱ মানুষেৰ কাছে একটা সৱল বাৰ্তা পোঁছে দিয়েছিল। তাৱা বোৰাতে পেৱেছিল যে, ঈশ্বৰলাভেৰ উপায় একমাত্ৰ মনেৰ ভক্তি দিয়ে আৱাধনা কৱা। সংস্কৃতিৰ উপৱেও এই ভক্তিসাধক এবং সুফিসন্তৱা নিজেদেৱ ছাপ রেখেছিল। এৱে প্ৰমাণ ভাৱতেৰ নানা প্ৰান্তে ছড়িয়ে আছে। দোহা, কবিতা, কীৰ্তন এবং নানান নৃত্যশৈলীতে (যেমন, মণিপুৰী নৃত্য) সেই ছাপ আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

৭.৩ শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব

শ্রীস্টীয় ঘোড়শ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসার জোরদার হয় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের চেষ্টায়। বাংলায়, বিশেষত রাত্ৰি বাংলায় বৈয়লু ধর্ম আগে থেকেই ছিল। শ্রীচৈতন্য সেই বৈয়লুবীয় ঐতিহ্য আর ভক্তিবাদের ভাবনাকে একাকার করে দেন। জাত-ধর্ম-বর্ণ এসব ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বৈয়লু ভক্তির প্রচার একটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নবদ্বীপ ছিল এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কেমন ছিল সেই সময়ের নবদ্বীপ? নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে অৱাহুণৱাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। গ্রামের ছবিটি একই রকম ছিল।

ডেবে ঘলো

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। তাদের জীবিকা ছিল নানারকম। শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গৰ্জবণিক, তাঙ্গুলি, বাদ্যকর, সাপেকাটার চিকিৎসক, বণিকপ্রভৃতি। তখনকার নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা আর শ্রীচৈতন্যের ভেদাভেদহীন ভক্তি প্রচার— এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়?

চৈতন্যের জন্মের অনেক আগে থেকেই বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হোসেনশাহিরাজত্বে শাসনকাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে কায়স্থদের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তার পাশাপাশি শাসক-আমলাদের অত্যাচারও ছিল। এইসব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উত্তর প্রচলিত হিন্দুধর্মে খুঁজে পায়নি সাধারণ গরিব মানুষ। ফলে, অনেকেই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তুলনায় উদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এর পাশাপাশি, আগে থেকেই নানান ধর্ম ও বিশ্বাস সমাজে চালু ছিল। আকর্ষণ ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিও। মনসা, চঙ্গী, ধর্ম—এই তিনি লৌকিক দেবদেবীর পুজোর চল ছিল।

তবে নবদ্বীপের পরিবেশে ভক্তিবাদের প্রচার সহজ ছিল না। ব্রাহ্মণ ‘ভট্টাচার্য’-রা বৈয়লুবদের প্রবল বিরোধিতা করত। ভক্তিবাদ ও বৈয়লুবদের উপহাস করত।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা মাত্র একটি সামাজিক নীতি মেনে চলায় জোর দিয়েছিলেন। সেই নীতিকেই ভক্তি বলা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য কোনো উদ্যোগ-আয়োজন লাগে না। সাধারণ জীবনযাপন এবং সহজসরল আচরণের উপরেই গুরুত্ব দিতেন শ্রীচৈতন্য। এতে কোনো আড়ম্বরের জায়গা ছিল না। চৈতন্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বৈয়লু ভক্তির জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের ছবি

কুমারদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বইয়ের প্রমাণ ধরলে চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। চৈতন্যের ছবি নানা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু ঠিক কেমন দেখতে ছিল চৈতন্যকে শুধু লিখিত প্রমাণ আছে তার। তাও সেই লেখা অনেক পরের। ফলে, চৈতন্যের যে ছবি আজ দেখা যায়, চৈতন্য আসলে তেমন দেখতে ছিলেন কি না, তা জানা যায় না। গৌতম বুদ্ধ বা বিষ্ণু খ্রিস্টের ছবির ক্ষেত্রেও একই রকম কথা বলা যায়।



টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের আহার

শ্রীচৈতন্য সন্ধ্যাস গ্রহণের পরে প্রায় উপোস করে দিন কাটাতেন। ভক্তরাই মাঝে মধ্যে নানা রকম রান্না করে তাকে খাওয়াতে চাইতেন। এমনই এক খাওয়ার বিবরণ বেশ মজার। শাক, মুগের ডাল, বেশি করে ঘি-মাখা ভাত, পটোল ও অন্যান্য সবজির তরকারি, কচি নিমপাতা ভাজা, বেগুন, মোচার ফট্ট, নারকেল, ঘন করে জাল দেওয়া দুধ, পায়েস, চাঁপাকলা, দই-দুধ দিয়ে চিঁড়ে আরও নানা কিছু। মজার ব্যাপার তরকারি রান্নায় বড়ির ব্যবহার হতো। আর আলুর ব্যবহার হতো না।

তবে চৈতন্য নিজে এত কিছু খেতেন না, ভক্ত এবং অনুচরদের খাওয়াতেন। কীর্তনিয়াদেরও খাওয়াতেন। আবার ক্ষুধার্ত মানুষদের ডেকে এনেও খাওয়াতেন। কখনওবা তিনি ভক্তদের সঙ্গে বনভোজনে যেতেন এমন কথাও শোনা যায়।

ভেষে বলো

চৈতন্যচরিতামৃত প্রথে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

“নীচ জাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়ো অভক্ত হীন ছাঢ়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার।।”

এর থেকে জাতপাতের প্রতি বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলনের কীরকম দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যায়?

চৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার এবং প্রসারের একটা পরিকল্পিত কাঠামো দেখা যায়। যেমন—

- চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে যে বৈষ্ণবগোষ্ঠী সংগঠিত হয় তাতে জাতবিচার ছিল না।
- চৈতন্য ঘরে ঘরে নামগান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে বিশাল শোভাযাত্রা করে নগরকীর্তনের ব্যবস্থা করেন।
- চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তথাকথিত নীচ জাতির মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন।
- কোনো প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা চৈতন্য করেননি। ভক্তি প্রচারকেই একমাত্র ধর্ম হিসাবে তুলে ধরেননি।
- নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচারের বিরোধিতা করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী নিত্যানন্দ। পাশাপাশি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ করেন তিনি। আবার কীর্তন-বিরোধী নবদ্বীপের কাজিকেও তর্কে হারিয়ে দেন। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা।
- চৈতন্য বৈষ্ণবীয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নেন। নিজে তাতে অভিনয়ও করেন।
- ভক্তি সাধকরা সবাই জনগণের মুখের ভাষাতে প্রচার করতেন। চৈতন্যও এর ব্যক্তিক্রম ছিলেন না। বাংলা ভাষাতেই তিনি ভক্তি প্রচার করেন।

এই বৈংশিভ ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল কী ছিল?

শ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় ভঙ্গি আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ না মানলেও সমাজে ভেদাভেদ থেকেই গিরেছিল।

সবরকম ভেদাভেদ পুরো দূর করতে না পারলেও, সেগুলিকে তুচ্ছ করা যায়— একথা চৈতন্য জোর দিয়েই প্রচার করেন। সেকালের তুলনায় ভাবলে এইটিই এক বড়ো সাফল্য ছিল। তবে চৈতন্য এবং তাঁর ভক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে (৭.৭.২ একক দেখো)।

ଟୁକରୋ କଥା

ਕੌਠੜ

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আগেও কীর্তন গান ছিল। চৈতন্য সেই কীর্তনগানকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। চৈতন্য দুরকমের কীর্তন সংগঠিত করেন। নামকীর্তন ও নগরকীর্তন। নামকীর্তন ঘরে বসেই গাওয়া যেত। নগরকীর্তন নগরে শোভাযাত্রা করে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো। কীর্তনে জাতবিচার ছিল না। নেচে নেচে, দু-হাত তুলে গান গেয়ে চলাই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ছিল। নামকীর্তন গাওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কবি পরমানন্দ লিখেছিলেন—

“নাচিতে জানি না তবু নাচিয়া গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে জানি না তব গাই।”

কীর্তন ছাড়া কথকথার মাধ্যমেও ভক্তির ভাব প্রচার করা হতো।

বৈয়ন্দের রচনায় সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের ছবিটি ধরা পড়ে।
বহু মুসলমান কবি বৈয়ন্দবগান-কবিতা লেখেন। ঘাঁটু, ঘাঁটু-তেলেনা, পুটুয়া,
রাসলীলা, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদির গানে আজও বৈয়ন্দব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এভাবেই ভক্তির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন শ্রীচৈতন্য।
বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এর মধ্য
দিয়ে। জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ইঙ্গুলাভের উপরে জ্ঞার পদেছিল।

বলা হতো : “জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।” অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা বা উচুবংশে জন্ম দিয়ে কিছু হয় না। ভক্তির মাধ্যমেই চৈতন্য লাভ হয়।

ଟୁକରୋ କଥା

શ્રીચાન્દુ જીરની

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই
বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য
লেখার ধারা বিকশিত
হয়েছিল। চৈতন্যের
জীবনীগুলির থেকে একদিকে
সমকালীন সমাজ এবং
অন্যদিকে ব্যক্তি চৈতন্যের
বিষয়ে আমরা নানা কথা
জানতে পারি।

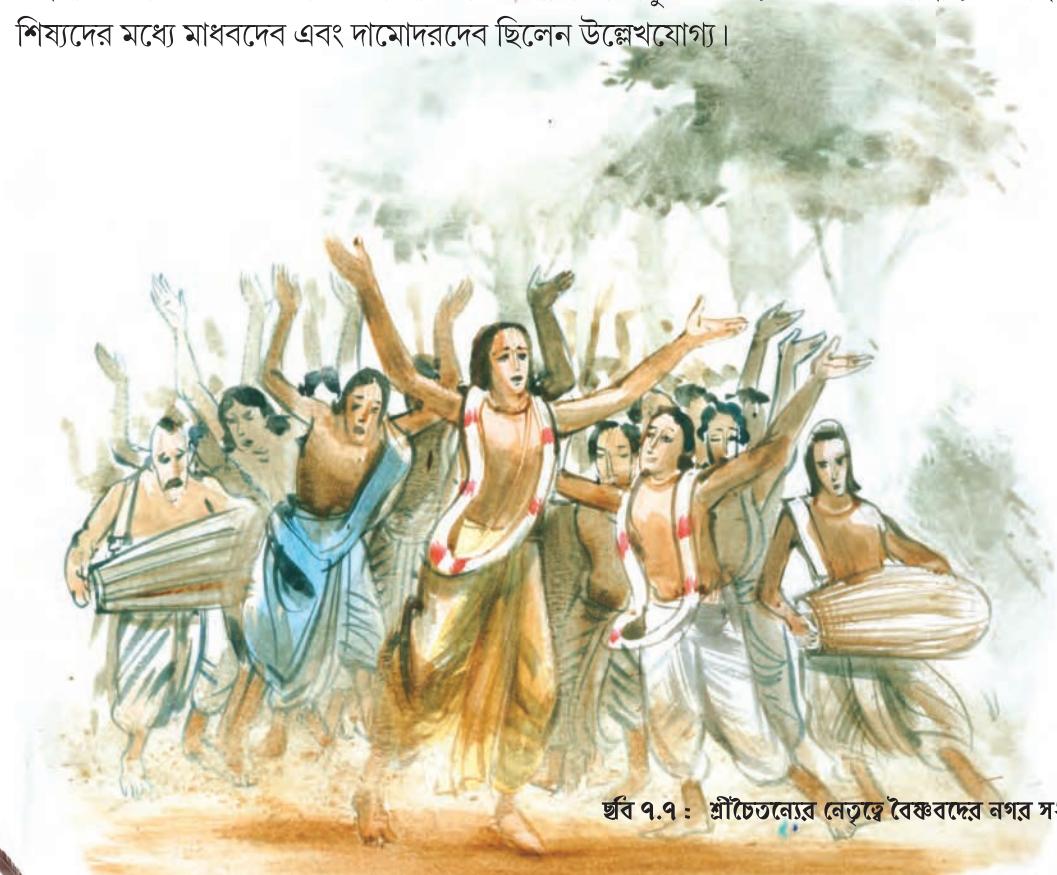


ভেবে বলো তো, কেন
শ্রীচৈতন্যকে দিঘেই
বাংলায় জীবনী সাহিত্যের
ধারা বিকশিত হয়েছিল ?

ଟୁକରୋ କଥା

ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ

ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକଟି ଧାରା ବିକଶିତ ହେଲା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତେର ଅସମେ । ଏର ନେତୃତ୍ବେ ଛିଲେନ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କରଦେବ । ତିନି ଛିଲେନ ପଞ୍ଚଦଶ-ବୋଡ଼ଶ ଶତକେର ମାନୁଷ । ଏକ କାଯାଶ୍ଵର ଭୁଲ୍ଲହା ପରିବାରେ ତାଁର ଜନ୍ମ ହେଲା । ଭାଗବତ ପୁରାଣେର ଏକ ଅଂଶ ତିନି ଅସମୀୟା ଭାସ୍ୟା ଅନୁବାଦ କରେଛିଲେନ । ତିନି ଛିଲେନ ଏକେଶ୍ଵରବାଦୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣର ଉପାସକ । ତାଁର ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତିର ମୂଳ କଥା ଛିଲ ‘ନାମ ଧର୍ମ’ । ତିନି ତାଁର ଅନୁଗାମୀଦେର କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗାନ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରତେ ଉପଦେଶ ଦିଯେଛିଲେନ । ତବେ ତିନି ରାଧାକୃଷ୍ଣର କାହିଁନିର ଉପରେ ଜୋର ନା ଦିଯେ କୃଷ୍ଣର ବାଲ୍ୟଲୀଲାକେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଯେଛିଲେନ । ଶଙ୍କରଦେବ ଛିଲେନ ଏକଜନ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ । ଅନେକ ଜ୍ଞାନଗାୟ ତିନି ‘ସତ’ (ବୈଶ୍ଵର ଭକ୍ତଦେର ଜମାଯେତ ହେତୁର ସ୍ଥାନ) ଗଡ଼େ ତୁଳେଛିଲେନ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଥାକତ ‘ନାମ ସର’ ଏବଂ ‘କୀର୍ତ୍ତନ ସର’ । ତାଁର ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତି ବସନ୍ତପୁତ୍ର ନଦୀର ଦୁ-ପାଡ଼େ ବସବାସକାରୀ କୃଷକ, ଛୋଟୋ ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ମତୋ ସମାଜେର ନୀଚୁ ତଳାର ମାନୁଷେର କାହେ ଜନପିଯ ହେଲା । ତାଁଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମୂଳ ସମସ୍ୟାର କଥା ଧରା ପଡ଼ତ ଏର ମଧ୍ୟେ । ପରେର ଶତକେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ ଅସମେ ଆରା ଶକ୍ତ ହେଲା । ଐ ସମୟେ ବସନ୍ତପୁତ୍ର ଅବବାହିକାଯ କରେକଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଛିଲ । ଅହୋମ ରାଜାରା ମୁଖଲଦେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇ କରେ ଅସମକେ ରାଜନୈତିକଭାବେ ଏକବନ୍ଧ କରେଛିଲେନ । କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରେ ଧାନ ଚାଷେର ବିଭାଗ ଅର୍ଥନୀତିତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯେଛିଲ । ଏହି ସମୟେ ଶଙ୍କରଦେବେର ଭକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ ଅସମେର ସାଧାରଣ ମାନୁଷକେ ଏକବନ୍ଧ କରତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛିଲ । ତାଁର ଶିଷ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଦାମୋଦରଦେବ ଛିଲେନ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।



ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟନେର ନେତୃତ୍ବେ ବୈଶ୍ଵରଦେହ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ।

৭.৪ দীন-ই ইলাহি

খ্রিস্টীয় ১৫৭০-এর দশকে বাদশাহ আকবর ক্রমশ সবার সামনে নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইসলামীয় আচার পালন করা বন্ধ করে দেন। এর বদলে তিনি নিজের পছন্দ মতো কিছু প্রথা পালন করতে শুরু করেন। এক সময়ে দিনে চারবার তিনি সবার সামনে পূবাদিকে মুখ করে সূর্যপ্রগাম করা এবং সূর্যের নাম জপ করা শুরু করেন। ফতেহপুর সিকরিতে তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্ম নিয়ে উলেমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরে তিনি নানান ধর্মের গুরুদের ডেকে ধর্মীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে এইসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি দীন-ই ইলাহি নামে এক নতুন মতাদর্শ চালু করলেন।

এক সময়ে ভাবা হতো দীন-ই ইলাহি বুবিবা বাদশাহ আকবরের প্রচলিত এক নতুন ধর্ম। কিন্তু, আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। ইসলাম ধর্মের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি মেনে নিতেন। নানা ধর্মের গুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিজের পছন্দ মতো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বেছে নিতেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আকবর দীন-ই ইলাহি তৈরি করেন। তিনি এর প্রচলন করেছিলেন নিজের সভাসদদের মধ্যে। কিন্তু, এখন এই সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পালটে গেছে। এখন মনে করা হয় যে, দীন-ই ইলাহি আসলে ছিল আকবরের প্রতি চূড়ান্ত অনুগত কয়েকজন অভিজাতদের মধ্যে প্রচারিত এক আদর্শ। আকবর নিজে তাঁদের বেছে নিতেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাদশাহের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকার শপথ নিত। এই হলো দীন-ই ইলাহি।

এইভাবে, আকবর নিজের চারপাশে গড়ে তুললেন বিশ্বস্ত অনুগামীদের একটি দল। একেকজন সদস্যের ছিল একেক ধর্ম। তাঁরা কেউ পারস্যদেশের লোক, কেউ হিন্দু রাজপুত, আবার কেউ বা ভারতীয় মুসলমান। দীন-ই ইলাহি কোনো আলাদা ধর্ম ছিল না।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গিরও দীন-ই ইলাহি চালু রাখেন। তাঁর এক সেনাপতি মির্জা নাথান, যিনি বাংলা ও আসামে বহুকাল যুদ্ধ করেন, ‘ইলাহি’-তে নিজের দীক্ষিত হওয়ার ঘটনার কথা লিখে গিয়েছেন নিজের আত্মজীবনীতে।

টুকরো কথা

টমাস রো-এর প্রিপারে দীন-ই ইলাহি

মুঘল রাজসভায় আসা প্রথম ইংরেজ দৃত টমাস রো-কেও সম্ভবত জাহাঙ্গির দীন-ই ইলাহিতে শামিল করেন। ভিন্নদেশ থেকে আসা দৃতটি কিছু না জেনেই দীন-ই ইলাহি-তে প্রবেশ করার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফেলেন। টমাস রো-এর লেখায় তাঁর সঙ্গে বাদশাহের এই মুহূর্তের একটি মজার বিবরণ পাওয়া যায় :

টুকরো কথা

দীন-ই ইলাহিতে শপথ থত্ত অনুষ্ঠান

যিনি দীন-ই ইলাহি গ্রহণ করতেন, তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে তার জীবন (জান), সম্পত্তি (মাল), ধর্ম (দীন) ও সম্মান (নামুস) বিসর্জন (কুরবান) দেওয়ার শপথ নিতেন। শিয় (মুরিদ) যেমন তার সুফি গুরুর (পির) পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তাঁকেও তেমনই বাদশাহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হতো। এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলে বাদশাহ তাঁকে দিতেন একটি নতুন পাগড়ি, সূর্যের একটি পদক ও পাগড়ির সামনে লাগাবার জন্য তাঁর (বাদশাহের) নিজের ছাটো একটি ছবি।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা



টমাস রো-র বিবরণ পড়ে
বাদশাহ জাহাঙ্গিরের
সম্পর্কে তোমার কী ধারণা
হয়?

আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি ঢোকামাত্র তিনি... আসফ খানকে একটি সোনার হার দিলেন। হারটিতে সোনার জলে আঁকা বাদশাহের নিজের একটি ছবি ও একটি মুক্তা লাগানো ছিল। তিনি আসফ খানকে নির্দেশ দিলেন যে [তিনি যেন হারটি আমাকে দেন, তবে] আমি যেটুকু সম্মান তাঁকে দেখাতে চাই, তার বেশি যেন তিনি আমার থেকে দাবি না করেন। এদেশের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহ কাউকে কিছু দিলে সেই লোকটিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হয়।... এরপর আসফ খান হারটি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি হাত বাড়িয়ে সেটি নিতে গেলাম; কিন্তু তিনি ইশ্বরায় আমাকে আমার টুপি খুলতে বললেন। [টুপি খোলার পর] আমার গলায় হারটি পরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাদশাহের সামনে নিয়ে গেলেন। আমার কী করণীয় বুঝতে পারলাম না, তবে সন্দেহ হলো যে, তিনি চান যে আমি ও দেশের প্রথা অনুযায়ী সিজদা করি [অর্থাৎ ঐভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাদশাহকে সম্মান দেখাই]। কিন্তু আমি তা না করে আমার আনা উপটোকন বাদশাহকে এগিয়ে দিলাম। আসফ খান আমাকে বাদশাহকে ধন্যবাদ জানাতে নির্দেশ দিলেন। আমি আমার নিজের দেশের প্রথা মেনে ধন্যবাদ জানালাম। তাই দেশে কয়েকজন সভাসদ আমাকে সিজদা করতে বললেন, কিন্তু বাদশাহ ফারসিতে তাঁদের জোর করতে নিয়ে করলেন। আমাকে তিনি নানা কথা বলে ফেরত পাঠালেন; আমি এরপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

এখানে মনে রেখো যে, তাঁর আগের বেশিরভাগ সুলতান বা বাদশাহের থেকে আকবরের রাজত্বের ধর্মীয় চরিত্র ছিল আলাদা। গোঁড়া ইসলামের ছায়া থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন ১৫৭০-এর দশক নাগাদ। মৌলিবি বা উলেমার কথামতো তিনি রাজ্য চালাতে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বহু ধর্ম এবং জাতির মানুষের বসবাস। সেখানে নিজের শাসন সুড়ত করতে গেলে কোনো একটি ধর্মের বুলি আউড়ালে চলবে না। নিজেকে এবং নিজের শাসনকে সবার কাছে মান্য করে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধর্ম থেকে নানা আচার-প্রথা গ্রহণ করতে হবে। এই বোধ থেকেই আকবর সূর্যপ্রগাম, সূর্যের নাম জপ, প্রাসাদের ঝরোখা (জানালা) থেকে সভাসদ এবং প্রজাদের দর্শন দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রথা চালু করেন। দীন-ই ইলাহির প্রথাগুলি ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যাকারদের চোখে ছিল ‘ইসলামবিরোধী’। কিন্তু, এই প্রথাগুলির মাধ্যমে আকবর ইসলামের গভির বাইরে বেরিয়ে রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

৭.৫ সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য

শ্রিস্টীয় অ্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে দিল্লি সুলতানি শাসন শুরু হয়। সুলতানরা দিল্লি আর অন্য নানা জায়গায় অনেক স্থাপত্য তৈরি করেন। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, মিনার, মন্দির-মসজিদ এসবকে স্থাপত্য বলে। এগুলি বানানোর কারিগরিকে স্থাপত্য শিল্প বলা হয়।

শ্রিস্টীয় অ্রয়োদশ শতকের অনেক আগেই ভারতে আরবি স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লি সুলতানির আগে তৈরি মসজিদের ভাঙা অংশের খোঁজ পাওয়া গেছে গুজরাটে। এর থেকে বোঝা যায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্প ভারতে সুলতানির আগেই এসেছিল। এই স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান এবং গম্বুজ।

তবে সুলতানি শাসন জারি হওয়ার পরেই ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প মিলেমিশে যেতে পেরেছিল। এই দুই শিল্পধারা মিশেই তৈরি হয় ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি। সুলতানরা যে দেশের শাসক, তারা যে ক্ষমতাবান সেটা বোঝানোর দরকার ছিল। আর তাই তারা বড়ো বড়ো স্থাপত্য বানান। সুলতানরাও সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মচর্চার জন্য মসজিদ, মিনার, পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসা, থাকার জন্য প্রাসাদ, দুর্গ এসব বানানো শুরু হলো। সুলতানরা বা তাঁর আত্মীয় বা অভিজাত কেউ মারা গেলে তাদের স্মৃতিতে সৌধ, মিনার বানানো হতো। মাঝে মধ্যে সুলতানরা নিজেদের জীবনকালেই নিজেদের সমাধি সৌধের মূল কাঠামোটি তৈরি করে রাখতেন। সব স্থাপত্যের গায়েই লেগেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সুন্দর কারুকার্যে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল স্থাপত্যগুলি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের পর কুতুবউদ্দিন আইবক কুয়াত-উল ইসলাম মসজিদ বানাতে শুরু করলেন। এদেশের লোক যাতে তাঁকে শাসক বলে মেনে নেয় তার জন্য এটি দরকার ছিল। আশপাশের সাতাশটি হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের ভাঙা অংশ এই মসজিদ বানানোর কাজে ব্যবহার হয়। তাই এই মসজিদে হিন্দু, জৈন এবং ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের মিলমিশ নজর টানে। এই মসজিদের মিনারটি হলো কুতুব মিনার। এই মিনার সুলতানি শাসনের প্রতীক হয়ে উঠল। কুতুবউদ্দিন মারা যাওয়ার পর মিনারটি বানানোর কাজ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ইলতুৎমিশের নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি এই যুগের আরেকটি চর্মকার স্থাপত্য।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমলে তৈরি হয় আলাই দরওয়াজা। এটি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের অসাধারণ নমুনা। লাল বেলে পাথরের তৈরি এই ‘দরওয়াজা’ যেন সুলতান হিসাবে আলাউদ্দিনের ক্ষমতার প্রতিফলন

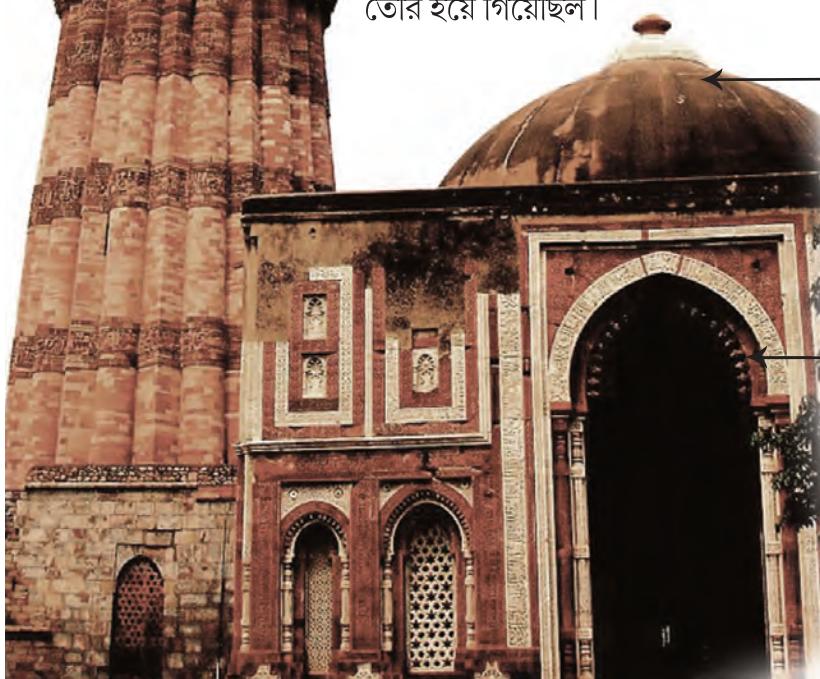
ঠিকণ ও প্রতিষ্ঠা

ছিল। দরওয়াজার গায়ে আল্লাহ-র কথা নয়, খোদাই করা হয়েছিল সুলতানের প্রশংসা। এমন কাজের নমুনা সে যুগে বিরল। এটিও ছিল ওই কুতুব-চতুরেই। কুতুব মিনার, ইলতুৎমিশের সমাধি, আলাই দরওয়াজা—সব মিলিয়ে কুতুব-চতুর হয়ে উঠল সুলতানি স্থাপত্যের নজির।

তুঁঘলক সুলতানরা নগর বা শহরের পরিকল্পনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহম্মদ বিন তুঁঘলকের দৌলতাবাদের দুর্গ-শহরে তেমন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়। ফিরোজ শাহ তুঁঘলকের ফিরোজাবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাধি সৌধ বানানোর প্রতিও তুঁঘলক সুলতানরা মনোযোগী ছিলেন। যেমন, দিল্লির তুঁঘলকাবাদে গিয়াসউদ্দিন তুঁঘলকের সমাধি। খাড়া দেয়ালের বদলে গম্বুজ-বসানো ঢালু দেয়াল ছিল এর বৈশিষ্ট্য।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতিতে লোদি সুলতানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আটকোণা সমাধি সৌধগুলি। চওড়া বাগানঘেরা চতুরে এই সমাধি সৌধগুলি তৈরি করা হয়েছিল। চতুরগুলির প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছিল বড়ো দরওয়াজা।

অতএব, মুঘলরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার আগেই দিল্লি সহ ভারতের নানা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামীয় ধারায় স্থাপত্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল।



ঞ্চি ৭.৮ :

কুতুব মিনার এবং আলাই
দরওয়াজা, দিল্লি।

আলাই দরওয়াজার খিলান এবং
গম্বুজ লক্ষ করো।



স্থাপত্যশিল্পের বিরাট বদল হয় মুঘল শাসনের সময়ে। মুঘল সন্মাটিরা প্রায় সবাই স্থাপত্যশিল্পের সমর্বাদার ছিলেন। নানান স্থাপত্যরীতির সহজ মেলামেশার ছাপ মুঘল স্থাপত্যে দেখা যায়।

সন্মাটি বাবরের ছিল বাগানের খুব শখ। চারভাগে ভাগ করা একরকম সাজানো বাগান মুঘল আমলে বানানো হতো। তাকে ‘চাহার বাগ’ বলে। হুমায়ুনের আমলে দীন পনাহ শহরটি বানানো শুরু হয়। আফগান শাসক শের শাহ সাসারাম এবং দিল্লিতে কয়েকটি সৌধ বানিয়ে ছিলেন। সাসারামে তাঁর নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি যেন তাজমহলের পূর্বসূরি।



ঞ্চিত ৭.৯ :
সুলতান ইনতুর্রেহিশের
সমাধি, কুতুব-চতুর, হিন্দু

ঞ্চিত ৭.১০ :
শেরশাহের সমাধি সৌধ,
সাসারাম, বিহার

ঠিতীত ও প্রতিষ্ঠা

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের প্রসার শুরু হয় সন্ধাট আকবরের সময় থেকে। ভারতে মুঘল শাসনের প্রসার এবং স্থাপত্য বানানোর কাজ আকবর একসঙ্গে করেছিলেন। দুর্গ-শহর, প্রাসাদ বানানোর আকবর মনোযোগী ছিলেন। এতে একদিকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আগ্রা দুর্গ এর অন্যতম উদাহরণ। আজমির, লাহোর, কাশীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুর্গ (গড়) গুলিও আকবরের সময়ে তৈরি করা হয়। গুজরাট জয়ের স্মৃতিতে আকবর বানিয়েছিলেন বুলন্দ দরওয়াজা।

ফতেহপুর সিকরি এবং তার প্রাসাদ, মসজিদ, মহল, দরবার আকবরের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ফতেহ মানে জয়। জয়ী সন্ধাট হিসাবে আকবর ধৰ্মস করেননি। বরং উদার মন আর সৌন্দর্যবোধ

নিয়ে তৈরী করেছেন ফতেহপুর সিকরি।

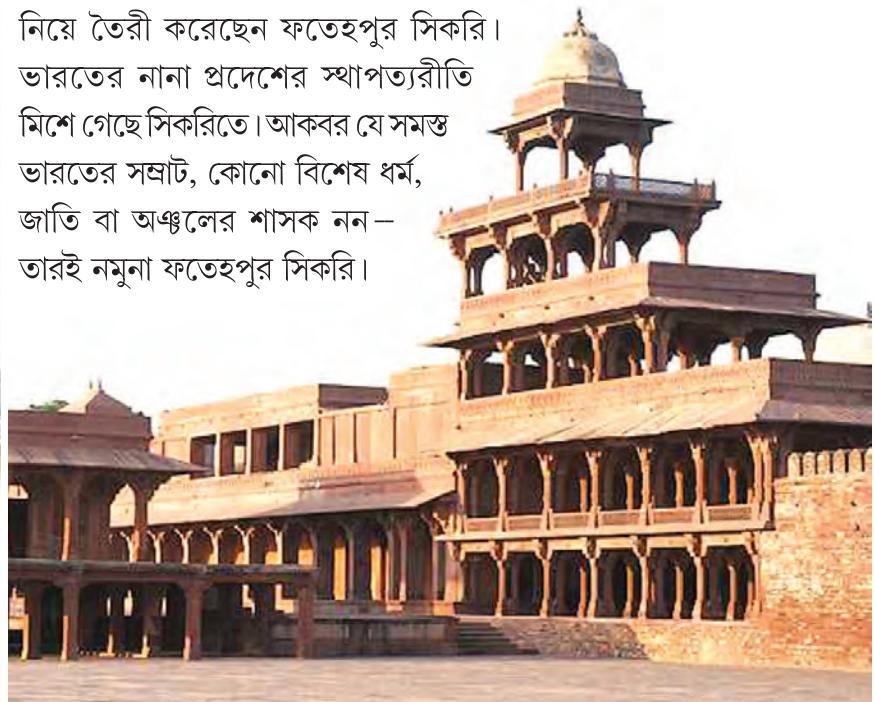
ভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্যরীতি

মিশে গেছে সিকরিতে। আকবর যে সমস্ত

ভারতের সন্ধাট, কোনো বিশেষ ধর্ম,

জাতি বা অঞ্চলের শাসক নন –

তারই নমুনা ফতেহপুর সিকরি।

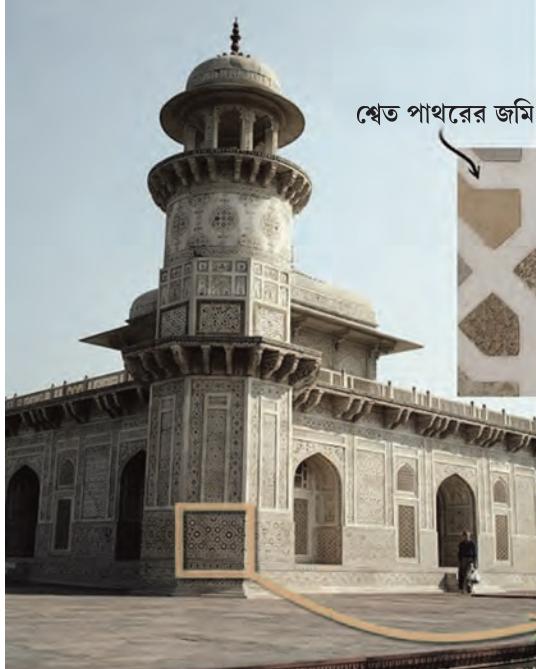


ছবি ৭.১১:
ফতেহপুর সিকরির
পঞ্চমহল বা বাদগির

জাহাঙ্গিরের সময়ে বাগান বানানোর উদ্যোগ আবার শুরু হয়। আগ্রায়, কাশীরে বানানো বাগানগুলির কথা সন্ধাট জাহাঙ্গির লিখেছেন তাঁর আগ্রাজীবন্নী তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি বইতে। এই সময়ে শ্রেতপাথরে রত্ন বসিয়ে একরকম কারুকার্য করার চল দেখা যায়। তাকে পিয়েত্রা দুরা বলে। জাহাঙ্গিরের সময়ে বানানো ইতিমাদ-উদ্দ দৌলার সমাধি সৌধে পিয়েত্রা দুরা কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায়।



পিয়েত্রা দুরা কারুকার্য
ইতিমাদ-উদ্দ দৌলার সমাধি সৌধ



খেত পাথরের জমি



খোদাই করা কারুকার্য



ছবি ৭.১২:
একটি মুঘলরীতির চাহার বাগ

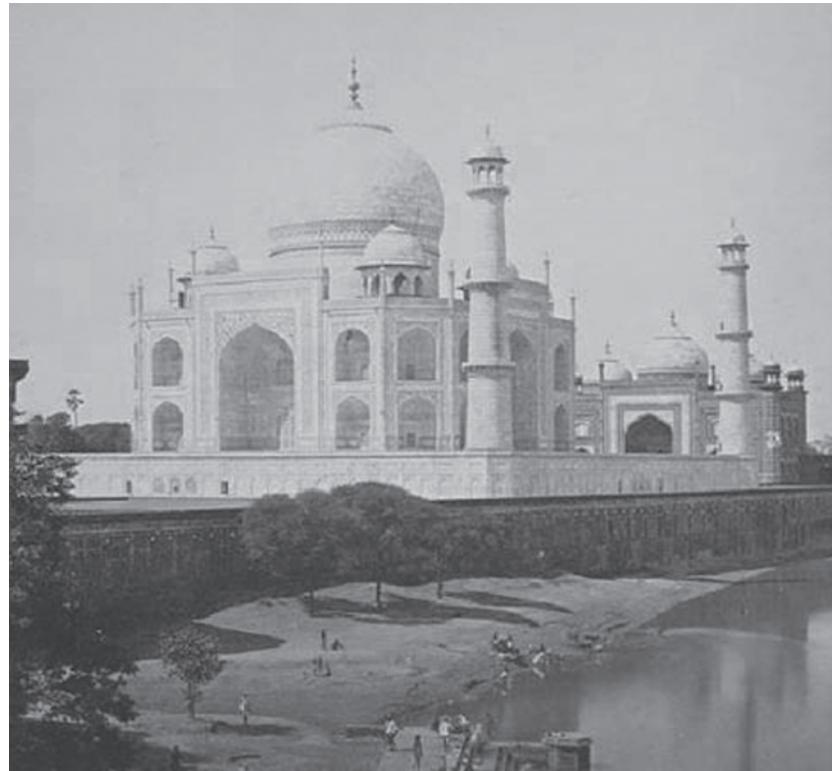
ছবি ৭.১৩:
ইতিমাদ-উদ্দ দৌলা-র
সমাধি সৌধ, আগ্রা।

ঠিকণ ও প্রতিষ্ঠা

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাজমহল। সম্রাট শাহ জাহানের সময়ে বানানো এই স্মৃতিসৌধটি এক আশ্চর্য স্থাপত্য। পাথরের ব্যবহার, কারুকার্য, শিল্পীর দিক থেকে তাজমহলের তুলনা নেই। তার পাশাপাশি লালকেল্লা, জামি মসজিদ এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে মোতি মসজিদ প্রভৃতি শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্পে উন্নয়নের সাক্ষী।

ঞ্চি ৭.১৪ :

তাজমহল, আগ্রা



দিল্লির সুলতান ও মুঘল
বাদশাহদের সময়ের
তৈরি স্থাপত্যগুলির
একটি তালিকা তৈরি
করো।

ওরঙ্গজেবের শাসনকালে সামাজ্যের মধ্যে নানান বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব সামলাতে জেরবার বাদশাহ স্থাপত্য বানানোর দিকে মন দিতে পারেননি। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই স্থাপত্যের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করাও সম্ভব ছিল না। তবে, ওরঙ্গজেবের সময়ে লালকেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ বানানো হয়। দাক্ষিণাত্যে ওরঙ্গজাবাদে তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত বিবি-কা মকবারা ঐ সময়ের বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প।

মুঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব গোটা দেশ জুড়েই লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের অনেক আঞ্চলিক স্থাপত্যশিল্পেও সেই ছাপ স্পষ্ট।

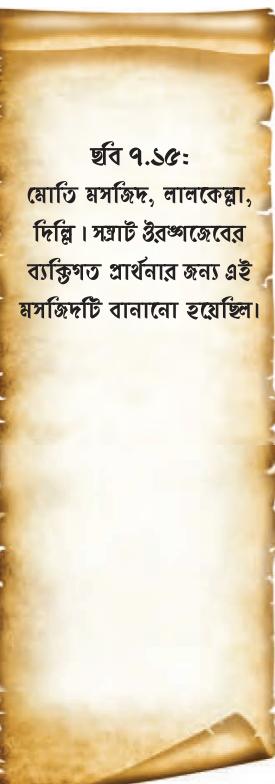


আঞ্চলিক স্থাপত্য

সুলতানি এবং মুঘল যুগে ভারতের নানা আঞ্চলে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে গুজরাট, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্প বিখ্যাত।

গুজরাটের স্থাপত্যগুলি সাংস্কৃতিক মিলমিশের নির্দর্শন। এতে ইসলামীয়, হিন্দু এবং জৈন নির্মাণশৈলীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আহমেদাবাদের জামি মসজিদ।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের প্রধান দিক হলো একাধিক দুর্গ ও দুর্গ-শহর। গুলবর্গা দুর্গ (১৩১৮ খ্রিঃ) এর অন্যতম উদাহরণ। বিদরের দুর্গ ও প্রাসাদগুলিতে ইরানি ধাঁচের দেয়ালচিত্র দেখা যায়। যদিও এদের অধিকাংশই এখন ভেঙে গেছে। তবে পালিশ করা চুনের দেয়ালে সোনালি, লাল ও নীল রং-এর অপূর্ব সব খোদাই কাজ এখনও বর্তমান। আহমেদনগরের চাঁদ বিবির প্রাসাদ একটি টিলার উপর আটকোণা ভিত্তির উপর নির্মিত। বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৭-'৫৬ খ্রিঃ) নির্মিত গোল গুম্বদ একটি সুন্দর স্থাপত্যকার্য। এর গম্বুজটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ। কুতুবশাহি আমলের হায়দরাবাদের চারমিনার (১৫৯১খ্রিঃ) আঞ্চলিক স্থাপত্যের চমৎকার নির্দর্শন।



ষ্ঠৰ ৭.১৫:

মোতি মসজিদ, লালকেল্লা,
দিল্লি। স্মার্ট প্রেঙ্গজেবের
ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য এই
মসজিদটি বানানো হয়েছিল।

ପୃଷ୍ଠା ୧.୧୬ :
ଚାରମିନାର, ହୀଲାଦୂରାବାଦ



ছবি ৭.১৭ :

গোল গুম্বদ, বিজাপুর



ছবি ৭.১৮ :

বিঠল ঘর্দিরের পাথরের রথ,
হাম্পি, বিজয়নগর



ঠিকণ ও প্রতিষ্ঠা



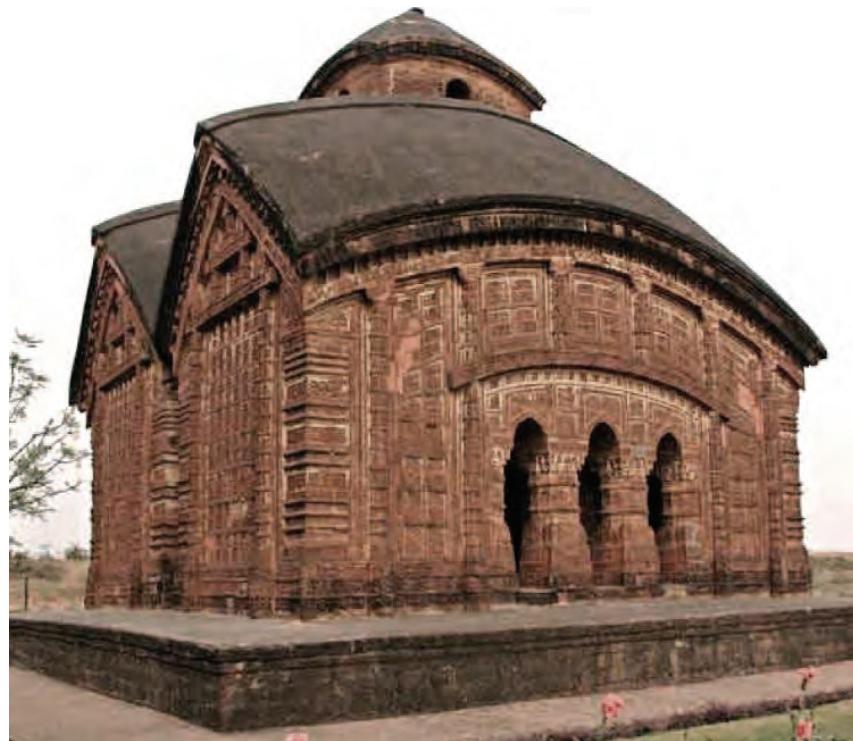
তোমাদের অঞ্জলে কোনো
পুরানো স্থাপত্য আছে?
থাকলে বন্ধুরা মিলে
সেখানে যাও। সেটা কবে
তৈরি, কেমনভাবে তৈরি
সেসব বিষয়ে ভালো করে
জানো। সেসব খাতায় লিখে
রাখো ও স্থাপত্যটির
একটি ছবি আঁকো।

বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি সমেত বহু জায়গাতেই মন্দির এবং
ইমারতগুলিতে দেখা যায় হিন্দু এবং ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির মেলামেশা।
কঙ্গনাশক্তি, কারুকার্য ও শৈলীর দিক দিয়ে এগুলি অতুলনীয়।

বাংলার স্থাপত্যরীতি

মুসলমান শাসন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে।
এই সময়ে বাংলায় কাঠামো নির্মাণের মূল গঠনভঙ্গি ছিল ইসলামি রীতি
অনুসারে। আর বাইরের কারুকার্য ও কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার
লৌকিকরীতির ছাপ দেখা যায়।

ইমারতে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। বাড়ি
এবং বেশির ভাগ মন্দির ঢালু ধাঁচে তৈরি করা হতো। এর পিছনে যুক্তি ছিল
বেশি বৃষ্টিতে জল দাঁড়াতে পারবে না। এই বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির নাম বাংলা।
অঞ্জলের নামেই স্থাপত্যরীতির নাম হওয়ার এটা একটা উদাহরণ। পুরোনো
অনেক মন্দিরের কাঠামো এই ধাঁচেই তৈরি হতো। এমনই দুটি কাঠামো
পাশাপাশি জুড়ে দিলে তাকে জোড়-বাংলা বলা হতো।



ঞ্চি ৭.৫৯ :

জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর
(১৬৫৫খ্রি:)

চাল বা চালাভিত্তিক মন্দির বানানোর রীতিও বাংলায় দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় ক-টি চালা আছে, সে হিসাবেই কোনও মন্দির একচালা, কখনো দো-চালা, কখনো বা আট-চালা হতো। ইসলামীয় স্থাপত্যের ধাঁচে চালা গুলির মাথায়ও মাঝেই খিলান, গম্বুজ বানানো হতো।

সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর উপর একাধিক চূড়া দিয়ে তৈরি মন্দিরও এই সময় বাংলায় বানানো হয়। সেই গুলির নাম রঞ্জ। একটি চূড়া থাকলে সেটি একরত্ন মন্দির, পাঁচটি চূড়া থাকলে পঞ্চরত্ন মন্দির।

এই মন্দিরগুলির বেশির ভাগের দেয়ালে
পোড়ামাটির বা টেরাকোটার কাজ করা হতো।

পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি বাঁকুড়া
জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাংলার নানা
অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এই যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১২০১-১৩৩৯ খ্রিঃ) বাংলার রাজধানী ছিল গোড়। ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধির ভগ্নাবশেষ, এবং বসিরহাট-এ ছড়িয়ে থাকা কিছু স্তুপ ছাড়া এসময়কার কোনও স্থাপত্যই আজ আর নেই।



ছবি ৭.২০ : পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর (১৬৫০খ্রিঃ)

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৩৯-১৪৪২ খ্রিঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হলো মালদহের পাঞ্চুয়ায় সিকান্দর শাহের বানানো আদিনা মসজিদ। এ ছাড়া, হুগলি জেলায় ছোটো-পাঞ্চুয়ার মিনার ও মসজিদ এবং গৌড়ের শেখ আকি সিরাজের সমাধি এই পর্যায়ের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।



ছবি ৭.২১ :
কিরোজ মিনার, গোড়া

তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৫৩৯ খ্রিঃ) বাংলায় ইন্দো-ইসলামি রীতির স্থাপত্য শিল্প সবচেয়ে উন্নত হয়। পাঞ্চুয়ায় সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহর (বদু) সমাধি (একলাখি সমাধি নামে বিখ্যাত) এই ধাঁচের সেরা নিদর্শন। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও, টেরাকোটার গম্বুজ ও তার অর্ধগোল আকৃতির জন্য এটি বাংলায় ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের উন্নতির অন্যতম নজির। বরবক শাহের আমলে তৈরি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা এসময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। এছাড়াও সে সময়ের রাজধানী গৌড়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের নজির হলো তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুম্বত মসজিদ ও লোটান মসজিদ। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ২৬ মিটার উচ্চতার ফিরোজ মিনার। ইট ও টেরাকোটার কাজ ছাড়া, এই মিনারটি সাদা ও নীল রং-এর চকচকে টালি দিয়েও অলংকৃত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বড়ো সোনা মসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ।

৭.৬ সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা

দরবারি চিত্রকলা

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগেও ভারতে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। মন্দির ও গুহার দেয়ালচিত্র তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সুলতানি ও পরে মুঘল যুগে মৌলিক পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে নানা চিত্ররীতির মিলমিশ লক্ষ করা যায় চিত্রকলায়। বিভিন্ন অঞ্চলেও নানারকম আঞ্চলিক চিত্ররীতি তৈরি হতে দেখা যায়।

সুলতানি যুগে বই এবং পাণ্ডুলিপিতে ছবি আঁকার চল দেখা যায়। সুন্দর হাতের লেখা, রঙিন ছবি সব মিলিয়ে বইগুলি সুদৃশ্য হয়ে উঠত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুলিতে এই প্রথার ছাপ পড়েছিল। কঙ্গসূত্র, কালচক্রকথা, চৌরপঞ্চাশিকা প্রভৃতি বইগুলিতে এধরণের লেখা ও ছবির ব্যবহার দেখা যায়। পারসিক মহাকাব্য শাহনামা-র ভারতীয় সংস্করণেও এধরনের রঙিন ছবি রয়েছে। তবে এই ছবিগুলির বিশেষ নির্দেশন দেখা যায় না।

এই চিত্রশিল্পীরা প্রধানত পশ্চিম ভারতের (গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল) বাসিন্দা ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। সুলতানি চিত্রশিল্পের ধারা মুঘল যুগে আরও পরিণত ও উন্নত হয়ে ওঠে।

বইতে ছবি আঁকার বা অলংকরণের প্রথা সম্ভাট বাবরের সময়েও দেখা যায়। এ ব্যাপারে হুমায়ুনের খুবই উৎসাহ ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে থাকার সময়ে তিনি আবদুস সমাদ ও মির সঙ্গী আলির কাজ দেখেন। মুগ্ধ হুমায়ুন পরে দিল্লিতে ফিরে তাঁদের নিয়ে মুঘল কারখানা খোলেন। সেই কারখানায় বইগুলি অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখা ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো হতো। হেজানামা বই-এর অলংকরণের কাজ হুমায়ুনের সময়েই শুরু হয়। সেই কাজ শেষ হয় আকবরের আমলে। এমন আরো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে রজমনামা, নল-দময়স্তী, জাফরনামা ইত্যাদিতে।

সুন্দর হাতের লেখার শিল্প সেকালে খুব চর্চা হতো। একে ইংরাজিতে বলে Calligraphy (ক্যালিগ্রাফি)। বাংলায় হস্তলিপিবিদ্যা বা হস্তলিপিশিল্প বলা যেতে পারে। ছাপাখানার রেওয়াজ ছিল না তখন। হাতে লেখা বইগুলিই ছিল শিল্পের নমুনা।



ছর্বি ৭.২২:

মুঘল কারখানায় বই
অলংকরণের কাজ করছে
শিল্পীরা।

সপ্তাট আকবরের সময়ে বইয়ের অলংকরণ শিল্পের আরও নমুনা পাওয়া যায়। তুতিনামা, রজমনামা (মহাভারতের ফারসি অনুবাদ) প্রভৃতি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাজানো হতো সুস্ক্ষম হস্তলিপি এবং ছবি দিয়ে। আকার এবং আয়তনে ছোটো এই ছবিগুলিকে বলা হয় মিনিয়েচার (Miniature)। মিনিয়েচার কথাটা ইংরাজি, তবে সেটাই বেশি প্রচলিত। বাংলায় তাকে অণুচিত্র বলা যেতে পারে। সোনার রং এবং অন্যান্য রঙের ব্যবহার হতো বহুতে। তাতে জুলজুল করত পৃষ্ঠাগুলি। লেখার চারপাশে নানারকম অলংকরণ করা হতো।

ବହୁ ଅଲଂକରଣେର ପାଶାପାଶି ପ୍ରତିକୃତି ଆଁକାଓ ଆକବରେର ସମୟ ଥେକେ ଶୁରୁ ହୁଏ । ଜାହାଙ୍ଗରେର ଆମଲେ ପ୍ରତିକୃତି ଆଁକାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ । ସେ ସମୟେ ଥେକେଇ ହୁଏ ଅନ୍ତରୀମ ଛବି ଆଁକାର ରୀତି-ନୀତିର ଛାପ ମୁଘଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେ ପଡ଼େଛି । ଛବିତେ ବାସ୍ତବତା ଓ ପ୍ରକୃତିବାଦ ଏର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ହତେ ଥାକେ । ଭାରତେର ପ୍ରକୃତି, ଉତ୍ସିଦ୍ଧ ଓ ପାଣୀ ଛବିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବେ ଉଠେ ଆସେ ।

ଛବି ୭.୨୩ :

ବାଦଶାହ ଜାହାଙ୍ଗରେର ହାତେ
ପୃଥିବୀର ଭାର (ପାର୍ବତୋମ
କ୍ଷମତା) ତୁଲେ ଦିଲ୍ଲେ
ବାଦଶାହ ଆକବର ।
ଉତ୍ତରାଧିକାର ମୂତ୍ରେ କ୍ଷମତା
ପାଞ୍ଚମାର ପ୍ରତୀକ ଏହି କାନ୍ଧାନିକ
ଛବିଟି ।



ଜାହାଙ୍ଗରେର ଆମଲେଇ ଶିଳ୍ପୀରା ପ୍ରଥମ ଛବିତେ ସ୍ଵାକ୍ଷର (ସହି) କରତେ ଶୁରୁ କରେନ । ତାତେ ବୋକା ଯେତ କୋନ ଛବି କାର ଆଁକା ।

ବାଦଶାହି ବା ଅଭିଜାତ ନାରୀରା ଅନେକେଇ ଛବି ଆଁକାର ବ୍ୟାପାରେ ଉଂସାହି ଛିଲେନ । ତବେ ବାଇରେ ଶିଳ୍ପୀଦେର ଦିଯେ ଅନ୍ଦରମହଲେର ମହିଳାଦେର ଛବି ଆଁକାନୋର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଛିଲ ନା । ନାଦିରା ବାନୁ, ସାହିଫା ବାନୁର ମତୋ ମୁଘଳ-ନାରୀରା ନିଜେରାଓ ଛବି ଆଁକନେନ ।

ସ୍ଥାପତ୍ୟେର ପାଶାପାଶି ଶାହ ଜାହାନେର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେ ଉଂସାହି ଛିଲ । ଛବିର ମଧ୍ୟେ କାହେ-ଦୂରେ ବୋକାନୋର ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମୟେ ଶୁରୁ ହୁଏ । ପାଦଶାହନାମା ପର୍ଯ୍ୟେର ଅଲଂକରଣ ଏହି ସମୟେର ବିଖ୍ୟାତ କାଜ । ଏହିବେଳେ ଛବିଗୁଲି ଶିଳ୍ପ ହିସାବେ ଅସାଧାରଣ । ଅନ୍ୟଦିକେ ସମକାଲୀନ ଇତିହାସେରେ ଉପାଦାନ ହେବାରେ ଉଠେଇଛେ ଛବିଗୁଲି ।

ଶାହଜାହାନେର ପାରେ ମୁଘଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେର ଉନ୍ନତି ବଡ଼ୋ ଏକଟା ଦେଖା ଯାଇ ନା । ସନ୍ତାଟ ଓ ରଙ୍ଗଜେବେର ସମୟେ ଦରବାର ଶିଳ୍ପୀଦେର କାଜ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ । ତାଦେର ଅନେକେଇ ମୁଘଳ ଦରବାର ଛେଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଲିକ ଶାସକଦେର ଦରବାରେ ଚଲେ ଯାଇ । ବାଦଶାହ, ଅଭିଜାତରାଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବେ ମୁଘଳ ଦରବାରି ଛବିଗୁଲିତେ ବୈଶି ଛାପ ରେଖେଛି । ତବେ ତାର ପାଶାପାଶି ସାଧାରଣ ମାନୁସ, ତାଦେର କାଜକର୍ମ ଓ ଛବିର ମଧ୍ୟେ ଫୁଟେ ଉଠେଇଛି ।

টুকরো কথা

মুঘল চিত্রশিল্প মঞ্চন্ধে আবুল ফজলের প্রিপোর্ণ

“মনে করা হয় যে, সাদা এবং কালো সব রঙের উৎস। এ-দুটিকে দেখা হয় পরম্পর বিরোধী রং হিসেবে এবং অন্যান্য রঙের অংশবৃপ্তে। তার ফলে যখন অনেকটা পরিমাণে সাদা মেশানো হয় কিছুটা ভেজাল কালোর সঙ্গে, উৎপন্ন হয় হলুদ রং। সাদা ও কালো সমান পরিমাণে মেশালে আসে লাল। যখন অনেকটা বেশি পরিমাণে কালো রঙের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা, পাওয়া যায় নীলচে সবুজ। এদেরকে মিশিয়েই অন্যান্য রঙও পাওয়া সম্ভব ...” — আবুল ফজল আল্লামি, আইন-ই আকবরি, আইন ৩৪ (“রঙের চরিত্র প্রসঙ্গে”)

কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য মিলিয়ে ছবি আঁকাকে বলে তসবির। বাদশাহ আকবর তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই ধরনের ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে বহু চিত্রকরণ পরিচিতি পায়। প্রতি সপ্তাহে দারোগা ও কেরানিরা সমস্ত চিত্রকরদের ছবি বাদশাহের সামনে পরিবেশন করত। তিনি তখন ছবির শৈলীক গুণের বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করতেন বা বাড়িয়ে দিতেন তাদের মাস মাইনে।

মুঘল শিল্পীদের ছবিতে যেন প্রাণহীন বস্তুও প্রাণ পায়। একশোর বেশি চিত্রকরণ হয়ে উঠেছিলেন ছবি আঁকায় অতুলনীয়।

এই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পারস্যের তাবরিজের মির সঙ্গদ আলি, সিরাজের খোয়াজা আবদুস সামাদ যাঁর ছদ্মনাম ছিল ‘শিরিন কলম’ অর্থাৎ মিষ্টি কলম, দসবন্ত এবং বসওয়ান। দসবন্ত ছিল এক পালকি বাহকের ছেলে। তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল এই শিল্পে। আঁকতে সে এতই ভালোবাসত যে দেয়ালেও এঁকে ফেলত মানুষের ছবি। স্বয়ং বাদশাহের সুনজরে পড়েন দসবন্ত। কালুক্রমে আঁকার দক্ষতায় বাকি সব শিল্পীদের সে ছাড়িয়ে যায়। অকালে তাঁর মৃত্যু হলেও দসবন্তের ছবিগুলো তাঁর প্রতিভার সাক্ষী। ছবির পটভূমিকা বা নানান অবয়ব আঁকতে, রঙের ব্যবহারে, প্রতিকৃতি আঁকতে বা অন্যান্য বহু শাখায় বসওয়ানের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।



ছবি ৭.২৪:

চিত্রনন্দ ও উদীয় নামের দুটি যুক্তের হাতি মড়াই করছে।
আকবরনামা-র একটি মুঘল প্রিপোর্ণ।

ଆଞ୍ଜଲିକ ଚିତ୍ରକଳା

ଟୁକରୋ କଥା

‘ଜଗତେର ବିଷ୍ଣୁ’

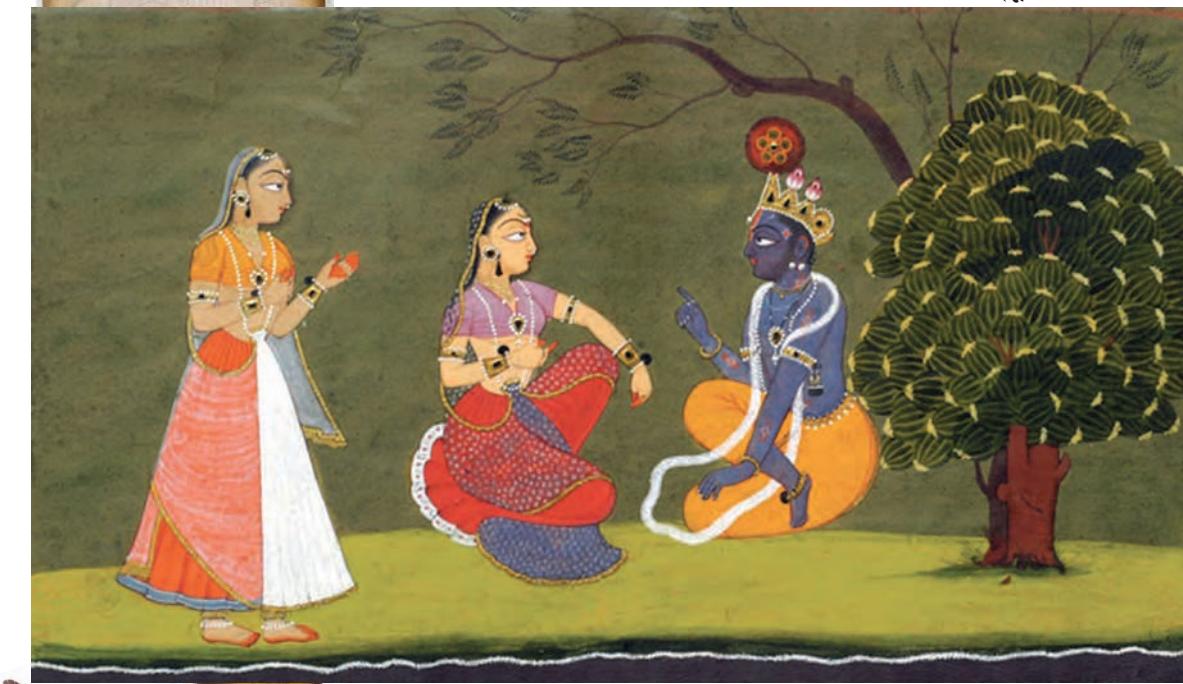
ବିଜାପୁରେର ସୁଲତାନ ଦିତୀୟ ଇବାହିମ ଆଦିଲ ଶାହ-ର ସମୟେ ସେଇ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଛିଲେନ ଫାରୁକ୍ ହୋସେନ । ତିନି ପ୍ରଥମେ ମୁଘଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରେର କାରଖାନାଯ ଯୋଗ ଦେନ । ୧୫୯୦ ଥେବେ ୧୬୦୫ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ଫାରୁକ୍ ହୋସେନ ହୃଦୀସରେ ମୁଘଲ କାରଖାନା ଥେକେ ଉଥାଓ ହେଁ ଯାନ । ମନେ କରା ହେଁ, ଏହି ସମୟେଇ ତିନି ଇବାହିମେର ଜନ୍ୟେ ଛବି ଆଁକାତେନ । ପରେ ହୋସେନ ଆବାର ମୁଘଲ କାରଖାନାଯ ଫିରେ ଯାନ । ଜାହାଙ୍ଗିର ତାଂକେ ନାଦିର ତାଲ - ଆସର (ଜଗତେର ବିଷ୍ଣୁ) ଉପାଧି ଦେନ ।

ମୁଘଲଦେର ଦରବାରି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେର ପାଶାପାଶି ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଜଲିକ ଛବି ଆଁକାର ରୀତି ଦେଖା ଯାଯ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେ ବିଜାପୁରେର ସୁଲତାନ ଦିତୀୟ ଇବାହିମ ଆଦିଲ ଶାହ (୧୫୮୬-୧୬୨୭ ଖ୍ରୀଃ) ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପେର ସମବାଦାର ଛିଲେନ ।

ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପାହାଡ଼ି ଆଞ୍ଜଲେ (ଜନ୍ମ, କାଶ୍ମୀର, କାଂଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି) ନାନାନ ଛବି ଆଁକାର ରୀତି ଦେଖା ଯାଯ । ମୁଘଲ ରୀତି ଓ ଆଞ୍ଜଲିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ଆଞ୍ଜଲିକ ଚିତ୍ରରୀତିଗୁଲିତେ ମିଳେମିଶେ ଗେଛେ । ଛବିର ବିସ୍ୟ, ରଙ୍ଗେର ବ୍ୟବହାରେର ଦିକ୍ ଥେକେ ଏଦେର ଆଲାଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ।

ପୌରାଣିକ ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ୟ ଏହି ଛବିଗୁଲିର ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ଛିଲ । ବିସ୍ୟବସ୍ତୁ ହିସାବେ ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ଖୁବ ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ କରା ଯାଯ । ଏର ପାଶାପାଶି ପ୍ରତିକୃତି ଆଁକାର ଚର୍ଚାଓ ଜନପିଯ ଛିଲ । ରାଜପୁତ ରାଜାରା ଛାଡ଼ାଓ ଜମିଦାରରାଓ ନିଜେଦେର ଏବଂ ତାଦେର ସଭାର ଛବି ଆଁକାତେନ । ତବେ ଏହି ପ୍ରତିକୃତିଗୁଲିର ପଟଭୂମି ଅନେକ ବେଶି ବାସ୍ତବଘେଣ୍ଟା ଛିଲ ।

ଛବି ୭.୨୫: ଆଲୋଚନାରତ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ, କାଂଡ଼ା ଚିତ୍ର ।



সংগীত ও নৃত্য

সুলতানি এবং মুঘল আমলে সংগীত এবং নৃত্য শিল্পের চর্চাও হতো। ভারতবর্ষের সংগীত চর্চা আর ইরানি সংগীতচর্চার ধারা মিলে মিশে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় ব্রহ্মাদশ শতাব্দী থেকেই সুফি পিররা সমা গানকে তাঁদের সাধনার অংশ করে তোলেন। পাশাপাশি ভক্তিধর্মের হাত ধরেও নানান আঞ্চলিক সংগীতচর্চা গড়ে উঠে। কবীর, নানক, মীরাবাঈ সকলেই গানকে তাঁদের দৈশ্বর সাধনার অংশ করে নিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তনের মাধ্যমেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হতো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা জারি ছিল। সেই সময়ের দুটি বই থেকে এবিষয়ে জানা যায়। আঞ্চলিক রাজ্যগুলি ও সংগীতচর্চার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। সংগীত বিষয়ে লেখা বই অনেক সময়ে রাজা, সুলতানদের উৎসর্গ করা হতো। জৌনপুরের ইবাহিম শাহ শরকিকে সংগীত শিরোমণি (১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) রচনাটি উৎসর্গ করা হয়। হোসেন শাহ শরকি নিজে সংগীত রাগ তৈরি করেছিলেন। তাকে হোসেনি বা জৌনপুরি রাগ বলে।

গোয়ালিয়ারের রাজা মান সিং তোমর (১৪৫০-১৫২৮খ্রি) ছিলেন সংগীতের সমবাদার। তাঁর সময়ে শাস্ত্রীয় ধূপদগুলি সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। মান-কৌতুহল সেই সময়ের একটি বিখ্যাত সংগীত গবেষণা প্রন্থ। বৈজু বাওরা এই আমলের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সেরা সংগীতপ্রেমী ছিলেন আকবর। তাঁর দরবারের গুণীজনদের মধ্যে সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন। আবুল ফজলের লেখায় ছত্রিশজন সংগীতশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তানসেন (১৫৫৫-১৬১০খ্রি) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর সৃষ্টি দীপক, মেঘমল্লার প্রভৃতি রাগ। শোনা যায় যে, তাঁর সংগীত সাধনা এমনই ছিল যে, তাতে নিজে থেকে প্রদীপ জ্বলে উঠত, কখনওবা অকালে বর্ষা নামত।

শাহজাহানের সময়েও মুঘল দরবারে সংগীতের প্রচলন ছিল। ওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বছর সংগীতশিল্পে উৎসাহী ছিলেন। তারপর সরকারি ভাবে সংগীতের পৃষ্ঠপোষণ বন্ধ হয়ে যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরেও সংগীতের ঐতিহ্য বজায় ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক সংগীতের সমবাদার ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেই ঐতিহ্য আজও চলেছে।



টুকরো কথা

আমিন খজান

সুলতানি আমলে আমির খসরু হিন্দুস্তানি এবং ইরানি সংগীতের মিলন ঘটান খসরু। দিল্লির সুলতান থেকে সুফি পির— খসরুর জনপ্রিয়তা ছিল সবাইরের কাছে। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণ্যাত্ম জয়ের পরে কণ্ঠটকী সংগীত শিল্পীরা দিল্লিতে এলে তাদের কাছেই আমির খসরু ভারতের প্রাচীন সংগীতচর্চার ব্যাকরণ শেখেন। শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে খসরুর অনেক লেখাও আছে। খেয়াল, তরানা, কওয়ালি প্রভৃতি সংগীতরীতি আমির খসরুর সৃষ্টি। মনে করা হয় সেতার, তবলা, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রগুলি ও তাঁর বানানো। এ ছাড়া আমির খসরু অনেক গজল এবং গীতিকাব্য লিখেছিলেন।

নৃত্যশিল্প : মণিপুরী নৃত্য

ভারতবর্ষে ধ্রুপদী নাচ মূলত ছ-টি : ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওড়িশি, কুচিপুড়ি, কথক এবং মণিপুরী। তারমধ্যে নবীনতম মণিপুরী নৃত্যশৈলীর কথা আমরা জানব। অষ্টাদশ শতকে

ভঙ্গির প্রবল প্রভাব পড়ে মণিপুরী সংস্কৃতিতে। তার ফলে তাদের আদি নৃত্য ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় ভঙ্গিরস।

সৃষ্টি হয় সংকীর্তন এবং রাসলীলা। বৈষ্ণব পদাবলির ভিত্তিতে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাসলীলাগুলি তৈরি করা হয়।

মণিপুরের মহারাজা
ভাগ্যচন্দ্রের হাতেই মণিপুরী
রাসলীলার ধারাগুলির বিকশিত
হয়। নাচের জন্য কুমিল পোশাকও
তিনি তৈরি করেন। সংকীর্তনে পুঞ্জ
নামের ঢোল বাজিয়ে মূলত ছেলেরাই
নাচে।



৭.৭ ভাষা ও সাহিত্য

৭.৭.১ আরবি ও ফারসি

ইসলামের জন্ম আরব দেশে। তাই তার প্রচলন আরবি ভাষার মাধ্যমেই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কিন্তু আরবি ভাষার প্রচলন ছিল সীমিত। আরবির কদর ছিল কেবল ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে। বেশ কিছু সরকারি বই আরবি ভাষায় লেখা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লেখা ফতাওয়া-ই আলমগিরি। এটি তখনকার আইন ব্যবস্থার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল। এটিকে কেউ কেউ ভারতে মুসলিম শাসনে লেখা শ্রেষ্ঠ মুসলমানি আইনের বই বলে থাকেন।

মধ্যযুগের ভারতে বরং আমরা দেখি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তা। ভারতে ফারসি সাহিত্যের শুরু সুলতানি শাসনের হাত ধরে।

দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা যখন ভারতে আসে তখন থেকেই বোধ হয় ফারসির প্রচলন ঘটে। এর আগে থেকেই অবশ্য ফারসি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে মধ্য এশিয়া এবং ইরানে প্রচলিত ছিল। সেখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ভাষা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর থেকে ভাবা হয়তো ভুল নয় যে তুর্কিরা ফারসি ভাষার শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। হয়তো সেই কারণেই ভারতে এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তুর্কিরা। কুতুবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিশ ফারসি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে খলজি যুগের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই লাহোর শহর হয়ে ওঠে ফারসি ভাষাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেসময় ফারসি সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে আমির খসরুর লেখা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। ১২৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বদাউনের কাছে পাটিয়ালিতে জন্ম খসরু। তিনি চিরকাল তাঁর ভারতীয়ত্বের গর্ব করতেন। খসরুর এরকম ভারত-প্রীতি থেকে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। তা হলো, কীভাবে ধীরে ধীরে তুর্কি শাসকরা তথাকথিত আক্রমণকারীর ভূমিকা বদলে এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার মানসিকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। খসরু অনেক কবিতা ও কাব্য লেখেন। সারাজীবন ফারসি কাব্য লেখার নানান পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান তিনি। খসরু ফারসি সাহিত্যের এক নতুন রচনাশৈলী সবক-ই হিন্দ-এর আবিষ্কারক।

এ সময়ে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও ফারসি হয়ে ওঠে অতি পছন্দের ভাষা। এই ভাষার বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা ছিলেন মিনহাজ-ই সিরাজ, ইসামি এবং জিয়াউদ্দিন বারনি। মধ্যযুগে বহু রচনা মূল সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এই ধারার প্রথম লেখক ছিলেন জিয়া নকশাবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা গল্পমালা ফারসিতে অনুবাদ করেন। তার নাম দেন তুতিনামা। এ ছাড়াও সে সময়কার কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবেদিনের উৎসাহে কলহন-এর রাজতরঙ্গিনী এবং মহাভারত ফারসিতে অনুবাদ করা হয়।

ফারসিতে অনুবাদের এই রেওয়াজ সমানভাবে চলতে থাকে তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি আমলেও। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে তার রাজধানী কিছু সময়ের জন্য দেবগিরি বা দৌলতাবাদে চলে যায়। তার ফলে দক্ষিণ ভারতে ফারসি চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের বাহমনি সুলতানেরাও ছিলেন ফারসি ভাষা চর্চায় খুব আগ্রহী। সেই কারণে বাহমনি-রাজধানী গুলবর্গা এবং বিদর হয়ে উঠেছিল ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যের এক নামি কেন্দ্র।

মনে রেখো

কুতুবউদ্দিন আইবকের সময়ের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন হাসান নিজামি। তাঁর লেখা ইতিহাসের নাম তাজ-উল মাসির। সেই বইতে নিজামি লিখেছেন—
‘সব যুগে জয়ের পরেই চলতি প্রথা ছিল বিরোধীদের দুর্গ
ও অন্যান্য ধাঁটি গুলি
বিশাল হাতিদের পায়ে পিয়ে
গুঁড়ো করে দেওয়া।’

শুধু ভারতবর্ষে কেন,
পথিকীর সব দেশেই জয়ীরা
পরাজিতদের সব শক্তি শেষ
করার জন্য এসব করত।
হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন,
মুসলমান, খ্রিস্টান সব
ধর্মের শাসকরাই একাজ
করেছেন। এটা আসলে
রাজনৈতিক শক্তি দেখানোর
একটা চেষ্টা।

ଟୁକରୋ କଥା

ଆକବରେର ଆମଲ ଅନୁବାଦ

ଅନୁବାଦ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ
ଆକବରେର ନିଜେର ଉତ୍ସାହେ
କହେକଜନ ଲେଖକ
ମହାଭାରତେର ନାନାନ ଅଂଶ
ଫାରସିତେ ଅନୁବାଦ କରେ /
ରଜମନାମା ନାମେ ସେଟି
ବିଖ୍ୟାତ / ବଦାଉନି କରେଛିଲେ
ରାମାଯଣେର ଅନୁବାଦ / ହାଜି
ଇରାହିମ ସିନ୍ଧି ଫାରସି ଭାଷାଯ
ବେଦେର ଅନୁବାଦ କରେନ / ତ୍ରିକ
ଭାଷାଯ ଲେଖା ବେଶ କିଛୁ ବିହିତ
ଫାରସିତେ ଅନୁବାଦ କରା
ହେଯେଛି / ରାଜା ଟୋଡ଼ରମଳ
ଭାଗବଂପୁରାଗ ଅନୁବାଦ କରେନ
ଫାରସିତେ /

ଫାରସିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଜନପିଯତା ଆରୋ ବେଡ଼େଛିଲ ମୁଘଲ ଆମଲେ । ସନ୍ତାଟ
ବାବର ଛିଲେନ ତୁର୍କି ଏବଂ ଫାରସି ଦୁଇ ଭାଷାତେଇ ସୁପଣ୍ଡିତ । ତାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁର୍କୁ-ଇ
ବାବରି ବା ବାବରନାମା ଲେଖା ହେଯେଛି ତୁର୍କି ଭାଷାତେ । ଏହି ବହଟି ଫାରସିତେଓ ଅନୁଦିତ
ହେଯେଛି । ହୁମାଯୁନଙ୍କ ଛିଲେନ ଫାରସିପ୍ରେମୀ । ଗୁଲବଦନ ବେଗମେର ଲେଖା ହୁମାଯୁନନାମା
ଫାରସି ଭାଷାଯ ଲେଖା ଏକଟି ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହିରାନ ଥେକେ ସଖନ ଭାରତେ ଫେରେନ ସନ୍ତାଟ
ହୁମାଯୁନ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଆସେନ ବହୁ କବି-ସାହିତ୍ୟିକ । ଯେମନ କାସିମ ଖାନ ମୌଜି । ଇନି
ଛିଲେନ ହୁମାଯୁନ ଏବଂ ଆକବରେର ସଭାକବି । ଶ୍ରିଷ୍ଟୀଯ ବୋଡ଼ଶ-ସପ୍ତଦଶ ଶତକେ ପାରସ୍ୟ
ଥେକେ ବହୁ କବି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଏସେ ମୁଘଲଦେର ଦରବାରେ ଭିଡ଼ ଜମାନ । ପାରସ୍ୟେର
ସଫାବି ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟ ତଥନ ପତନରେ ମୁଖେ । ତାଇ ସ୍ଵାଭାବିକଭାବେଇ ଓଖନକାର ଗୁଣୀ ମାନୁଷଜନ
ଚଲେ ଆସେ ଭାରତେ । ପାରସ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତେର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଘଟେଛିଲ
ଫାରସି ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ । ଏତେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେଯ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର । ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ
କାବ୍ୟରୀତିର ଜମ ହେଯ ଫେଜି, ଉରଫି, ନାଜିରି, ବେଦିଲେର ମତୋ କବିଦେର ଲେଖାଯ ।

ସନ୍ତାଟ ଆକବରେର ଆମଲେ ଫାରସି ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ରମଶ ଉନ୍ନତ ହତେ
ଥାକେ । ତାର ସମୟେର ରଚନାଗୁଲିକେ ପ୍ରଧାନତ ତିନ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯେତେ ପାରେ ।
ଏକଟି ହଲୋ ଇତିହାସ ଲେଖା । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ । ତୃତୀୟଟି ଛିଲ କବିତା ।
ଇତିହାସେର ଉପଲେଖ୍ୟାଗ୍ୟ କାଜେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ ଆବୁଲ ଫଜଲେର ଆକବରନାମା
ଏବଂ ଆଇନ-ଇ ଆକବରି, ବଦାଉନିର ମୁନ୍ତାଖୀବ-ଉତ୍ତର ତତ୍ତ୍ଵାରିଖ ଏବଂ ନିଜାମଉଦ୍ଦିନ
ଆହମେଦେର ତବକାତ-ଇ ଆକବରି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଆକବରେର ମତୋ ସନ୍ତାଟ ଜାହାଙ୍ଗିରଙ୍କ ଫାରସିର ଅନୁରାଗୀ ଛିଲେନ । ତାର
ଶାସନକାଲେ ଭାରତେର ନାମି କବି ଛିଲେନ ତାଲିବ ଆମୁଲି । ଶାହ ଜାହାନେର
ସମୟେଓ ଏହି ଚର୍ଚା ସମାନଭାବେ ଚଲତେ ଥାକେ । ଏର ପ୍ରମାଣ ଆବଦୁଲ ହାମିଦ ଲାହୋରିର
ମତୋ ବିଖ୍ୟାତ ଇତିହାସିକେର ଲେଖା । ଫାରସିତେ ଅନୁବାଦେର ଏହି ଧାରା ଏକେବାରେ
କମେ ଆସେ ଓରଙ୍ଗଜେବେର ରାଜତ୍ଵକାଲେ । ମନେ କରା ହେଯ ଯେ, ତିନି ପାରସ୍ୟଦେଶ
ଥେକେ ଆସା କବି-ସାହିତ୍ୟକଦେର ପ୍ରତି ତେମନ ସଦୟ ଛିଲେନ ନା । ତବେ
ଓରଙ୍ଗଜେବେର କନ୍ୟା ଜୈବଉନନିସା ଆରାବି ଏବଂ ଫାରସି ଭାଷା ଭାଲୋବାସତେନ ଓ
ତାତେ କବିତାଓ ଲିଖିତେନ । ସନ୍ତାଟ ଓରଙ୍ଗଜେବେ ନିଜେଓ ଏହି ଭାଷା ଭାଲୋମତୋଇ
ଜାନିତେନ । ତାର ପ୍ରମାଣ ଫାରସିତେ ଲେଖା ତାର କିଛୁ ଚିଠିପତ୍ର ।

ଉପରେର ଆଲୋଚନା ଥେକେ ତୋମରା ଯଦି ଭାବୋ ଯେ, ଫାରସି ଭାଷା ଶୁଦ୍ଧ
ମୁସଲମାନ ସମାଜେଇ ସୀମାବନ୍ଧ ଛିଲ— ତବେ ତା ଭୁଲ ହବେ । ଅନ୍ୟରାଓ ଏହି ଭାଷାଯ
ସମାନ ପଟ୍ଟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ଛିଲ । ଏର ପ୍ରମାଣ ରଯେ ଗେଛେ ଈଶ୍ଵରଦାସ ନାଗର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ
ବାନ୍ଧୁନ ବା ଭୀମସେନ ବୁରହାନପୁରିର ମତୋ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖକଦେର ରଚନା ।

৭.৭.২ বাংলা সাহিত্য

সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে কেমন ছিল বাংলা ভাষা তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সেই সময়কার কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়ু চট্টীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এর ভাষা থেকে সুলতানি আমলের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে।

শ্রীস্টীয় পঞ্জদশ শতকে ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু হলো বাংলায়। সেই সময় থেকে বাংলা ভাষায় লেখালেখির উদাহরণ পাওয়া যায়। এ ধারা বাকি সুলতানি এবং মুঘল আমলে বজায় ছিল।

শ্রীস্টীয় পঞ্জদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত কেমন ছিল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য? আজকের মতো তখনও বাংলা ভাষা ছিল নানা রকম। তখনকার সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা প্রচারের ছাপ ছিল; কিছু কিছু গীতিকায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও ধরা থাকত।

যা লেখা হতো, তার বেশিরভাগই সুর করে গাওয়া হতো। তাই এই সময়ের অনেক লেখালেখিকে পাঁচালি বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ বা দেবদেবীর পাঁচালি সবই গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

ভক্তিধর্মের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে খুব গভীর। শ্রীচৈতন্য এবং তার বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ নিয়ে অনেক সাহিত্য লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাব্য লেখার চল ছিল। তার পাশাপাশি ছিল রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে পদ-কবিতা লেখার ধারা। তাকেই বলে পদাবলি সাহিত্য।

রামায়ণ, মহাভারত সেই সময়েও খুব জনপ্রিয় ছিল। এই দুই মহাকাব্যের নানা দিক নিয়ে অনেকেই এই সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ তো ছিলই। রামায়ণ অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওরা। কাশীরাম দাস মহাভারত-এর অনুবাদ করেছিলেন। ভাগবত-এর খানিক অংশ সে যুগের সরল বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সেই অনুবাদটির নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়। অনুবাদটি করেন মালাধর বসু।

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি পুরোনো এবং প্রধান ধারা ছিল মঙ্গলকাব্য। চট্টী, মনসা, ধর্ম এইসব দেব-দেবীর পুজোর চলনতো ছিলই। সেই পুজোর সময়ে ঐ দেব-দেবীর মহিমা শোনানো হতো গান গেয়ে। সেই গানগুলোর ভিতরে একটা গল্প থাকত। সেই গল্পগুলোকে ধরে বেশ কিছু সাহিত্য লেখা হয়। সেগুলোকেই মঙ্গলকাব্য বলে। ‘মঙ্গল’ মানে ‘ভালো’। যে দেবতা বা দেবীর নামে মঙ্গলকাব্য লেখা হতো, তার পুজো করলে ভালো হবে—সেটাই

টুকরো কথা

মঠাকাঠ্যের পাতলা
অনুবাদ

রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত সবগুলোই আসলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু, যখনই কবিরা সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তখনই তার ভিতরে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সেই সময়কার বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে এই অনুবাদ গুলিতে। বাল্মীকির লেখা রামায়ণের রাম আর কৃত্তিবাসের রামের চরিত্র অনেক আলাদা।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

স্বৰ্ব ৭.২৭ :

মনসামঙ্গল কাব্যের একটি
স্বৰ্ব। স্বৰ্বচিত্তে বেহুলা মৃত
মথিদ্বয়কে নিয়ে ভেলায়
ভেসে যাচ্ছে।

বলার চেষ্টা ছিল। চণ্ডীদেবীকে
নিয়ে লেখা হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গল।
দেবী মনসাকে ঘিরে লেখা
হয়েছিল মনসামঙ্গল। ধর্মঠাকুর
ছিলেন ধর্মঙগল-এর কেন্দ্রে।
অনেক কবিই মঙ্গলকাব্য
লিখেছেন। তবে সবগুলিতেই
গঙ্গের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত
ঐ দেবী বা দেবতার পুজো করার
কথা বলা হয়েছে।

চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি
দেবী-দেবতা সমাজের নীচু
তলার মানুষের পুজো পেতেন।



মনে রেখো

নাথ-সাহিত্যের একটা বিখ্যাত
অংশ হলো ময়নামতীর কথা
ও গোপীচন্দ্রের গান। শুধু
বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন
অঞ্চলে এই কথা ও গানটি
প্রচলিত। এই গল্পটি বাংলা
থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল
বিহার, পঞ্জাব, গুজরাট,
মহারাষ্ট্র।



তেবে বলোতো, কিভাবে
সেই যুগে এই গল্পটি বাংলা
থেকে অন্যান্য অঞ্চলে
ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে?

তাই এদের নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে গরিব, সাধারণ মানুষের জীবনের
ছবিও পাওয়া যায়। শিবকে নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়েছে। সেই
লেখাগুলিকে শিবায়ন বলে। পুরাণে শিব বিষয়ে যে কাহিনি তার সঙ্গে
শিব-দুর্গার ঘর-সংসারের কথা জুড়ে শিবায়ন কাব্যগুলি লেখা হয়েছে। গরিব
শিব-দুর্গা এবং তাদের জীবনের কথা এসেছে ঐ লেখাগুলিতে। শিব সেখানে
চাষবাস করে রোজগারের চেষ্টা করে। এই লেখাগুলিতে সেই সময়ের বাংলার
গরিব কৃষক পরিবার যেন শিব-দুর্গার পরিবার হয়ে গেছে।

নাথ-যোগী নামের এক ধর্ম সম্প্রদায় এই সময়ে বাংলায় ছিল। তাদের
দেবতা শিব। এই নাথ-যোগীদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ নিয়েও এই সময়ে
সাহিত্য লেখা হয়। তাকে বলে নাথ সাহিত্য। এই লেখাগুলিতে সন্ধ্যাস-জীবন
যাপনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

ত্রীচৈতন্যের জীবন এবং কাজ নিয়ে লেখালেখির ধারা এই সময়ে শুরু
হয়। চৈতন্যের জীবনী নিয়ে কাব্য লেখেন অনেক বৈষ্ণব কবি। এগুলিকে
চৈতন্যজীবনীকাব্য বলা হয়।

আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলমিশ ঘটিয়ে এই সময়ে
লেখালেখির ধারা ছিল। সৈয়দ আলাওল এবং দৌলত কাজি সেই ধারার কবি।
আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির চিতোর রাজ্য
অভিযানের কথা আছে।

৭.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এক সময়ে অনেকেই ভাবতেন যে প্রাচীনকালই ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টির ‘সুবর্ণ যুগ’। তুলনায় মধ্যযুগ হলো ইতিহাসের এক ‘অন্ধকার সময়’। তাদের মতে ঐ সময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির চাকা প্রায় থেমে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আর পাঁচটা সময়ের মতো মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলো।

বিজ্ঞানে উন্নতির বহু তথ্য আমরা পাই অল বিরুনির কিতাব-অল হিন্দ-এ। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই লেখার মধ্যে দিয়েই তামাম ইসলামি দুনিয়ায় তিনি ছড়িয়ে দেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা। ঠিক কেমন ছিল বিজ্ঞান নিয়ে তখনকার ভারতীয়দের ভাবনা?

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি ঘটে মধ্যযুগে। এর আরম্ভ সুলতানি আমল থেকে। দিল্লিতে একটা উঁচু মিনারের উপর ফিরোজ শাহ তুঘলক তৈরি করান একটা মানমন্দির। তার উপর বসানো হয় একটা সূর্যঘড়ি। এছাড়া খ্রিস্টীয় অর্যোদশ শতক থেকে চৈনিক চৌম্বক কম্পাস এর ব্যবহার শুরু হয় ভারতের সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে।

মুঘল বাদশাহ আকবর ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের বিষয় খুবই আগ্রহী। তাঁর দরবারে অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়—যেমন জিনিসের দাম, জনসংখ্যা, ফুল-ফল, আবহাওয়া, খাজনার হার ইত্যাদির হিসাবপত্র সুষ্ঠুভাবে রাখা হতো। এছাড়া আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে, শিক্ষিত না হলেও আকবর নিজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ রাখতেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজও করতেন। সন্তাট জাহাঙ্গির তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি-তে উদ্দিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার বিষয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন জয়পুরের রাজা সওয়াই জয় সিংহ। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বারাণসীতে মানমন্দির তৈরি করেন।

মধ্যযুগের ভারতে সুলতানি শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি হয় গ্রিকো-আরবি ধারার ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের। উত্তর ভারত থেকে এই চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমশ অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসাও চালু ছিল সর্বত্র। ফাঁসোয়া বার্নিয়েরের মতো



ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের হাত ধরে ইউরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিও ভারতে আসে খ্রিস্টীয় সম্পদশ শতকে।

সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই সময়ে বড়ো রকমের বদল হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বারুদ-ব্যবহারকারী আগ্নেয়ান্ত্র চিন থেকে মোঙ্গলদের হাত ঘূরে প্রথমে ভারতে এসে পৌঁছয়। এর কিছু পরে ভারতের কিছু অঞ্চলে শুরু হয় বারুদচালিত রকেটের ব্যবহার। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিন ও মামেলুক-শাসিত মিশর থেকে বন্দুকের প্রযুক্তি আসে ভারতে। খ্রিস্টীয় ঘোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পোর্তুগিজরা এই প্রযুক্তি দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে দেয়। এই সময়ের আশেপাশেই মুঘলরাও উত্তর ভারতে যুদ্ধে ব্যাপকভাবে বন্দুক ও কামানের ব্যবহার চালু করে। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সময় ঘোড়ার দু-পাশে সেনিকের পা রাখার জন্য পাদানির (রেকাব) ব্যবহার তুর্কি বাহিনীকে বাড়তি সুবিধা দিত। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং রণহস্তীর সঙ্গে এ দেশের রাজা-বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীতে ক্রমশ কামান-চালক এবং বন্দুকধারী সৈন্যরা

ৰ্থ ৭.২৮ :

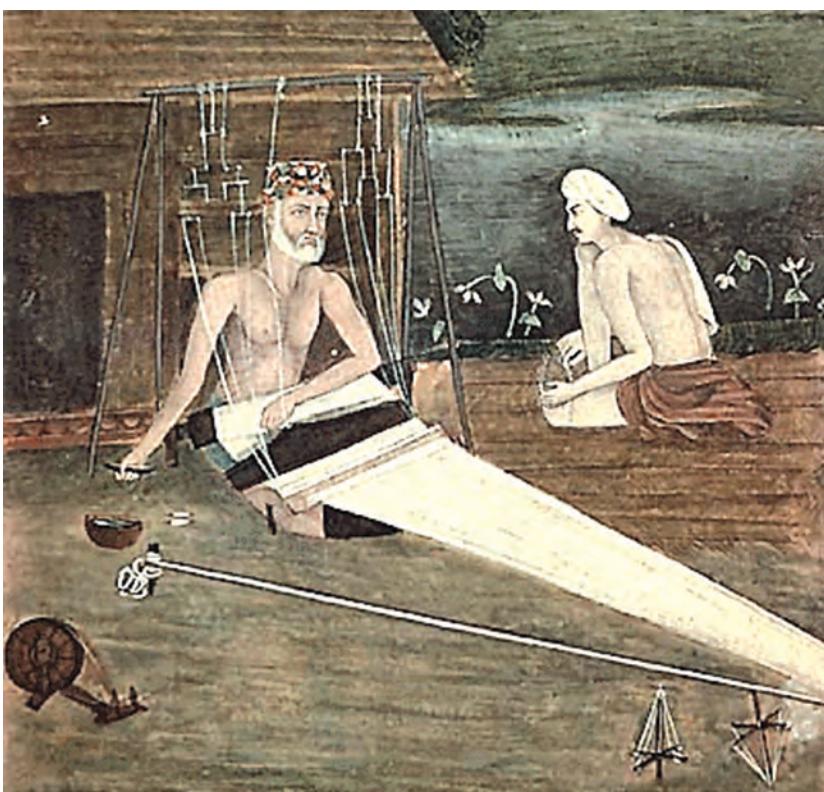
মুঘলদের বণ্যাল্পের দুর্গ
অভিযানের একটি র্থব।
কামান পাহাড়ি পথে উপরে
তোলার জন্য গবান্তি পশুর
ব্যবহার হতো।

জায়গা করে নিতে থাকে।

ভারতীয়রা আদিকাল থেকে তালপাতায় কিংবা গাছের ছালে লিখত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চিনে প্রথম কাগজ আবিস্কৃত হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে কাগজ তৈরি করার প্রযুক্তি চিন থেকে প্রথম নিয়ে আসে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলরা। অল্প কিছু কালের মধ্যেই ভারতে কাগজের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ার কাজ সহজ হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ভারতে কাগজ নাকি এতটাই সন্তা হয়ে ছিল যে, ময়রা মিষ্টি দেবার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাও করেন ইউরোপীয় মিশনারিরা। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তির প্রচলনের জন্য অবশ্য আরো বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।

মধ্যযুগের ভারতে বয়নপ্রযুক্তিতেও (কাপড় বোনা) নানা রকম বদল হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছয় তুলো বুনবার যন্ত্র ‘চৱি’। এই সময় নাগাদই কাপড় বুনবার তাঁতেরও প্রচলন হয়। বিভিন্ন ছবিতে সন্ত কৰীরকে তাঁত বুনতে দেখা যায়।





ষ্টৰ্ব ৭.২৯:
পল্ল কবীর তাঁত বুনজ্ঞে।

এর কিছু পরে খ্রিস্টীয় ব্রহ্মোদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কিশাসকদের সঙ্গেই ভারতে আসে চরকা। ভারতে এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ইসামির ফুতুহ-উস সালাতিন বইতে। তুলো থেকে সুতো বোনবার এই প্রযুক্তি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় ভারতে বস্ত্রশিল্প, বিশেষত কাপড় রং করার এবং ছাপার পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। নানা ধরনের কাপড় তৈরি হতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ভারতে ‘রুক’ ছাপাইয়ের আরম্ভ হয়। এই শিল্প ক্রমশ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ঘোড়শ শতক নাগাদ ছিট (Chintz) ভারতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে ছাপা কাপড় রপ্তানিও করা হতো।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে ভারতে বিশেষত বাংলায়, রেশমশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুঁত গাছের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করার প্রযুক্তি এদেশে আসে চিন থেকে। অনেকটা বারুদ ও কাগজের মতোই। এর পর আগামী দুশো বছর ধরে বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার অঞ্চল ছিল ভারতের গুটিপোকা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে দেশে-বিদেশে রেশম রপ্তানি করা হতো।

ছবি ৭.৩০: চাহার বাগ
তৈরির কাজ তদ্বারক
করছে বাদশাহ বাবর।

টুকরো কথা

চাহার বাগ

মুঘলরা খ্রিস্টীয় মোড়শ শতকে ভারতে নিয়ে আসে নতুন এক বাগান বানানোর কৌশল। ফারসিতে এর নাম চাহার বাগ (হিন্দিতে চার বাগ)। একটি বাগানকে জল দিয়ে চারটি সমান আয়তনের বর্গে ভাগ করা হতো। তার পর গোটা বাগানে নানরকম ফুলফলের গাছ লাগিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। পারস্যে ও মধ্য-এশিয়া থেকে এই বাগান-রীতি মুঘলরা ভারতে নিয়ে আসে। মুঘল বাদশাহদের মধ্যে বাগান করার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ রাখতেন বাবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহান। লাহোরের শালিমার বাগ, কাশ্মীরের নিসাত বাগ, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি ও আগ্রাতে তাজমহলে এই চাহার বাগের নির্দশন পাওয়া যায়।



খ্রিস্টীয় ব্রহ্মদেশ শতক নাগাদ পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসে বেল্ট এবং গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র (Persian Wheel)। ছোটো নাগরদোলার মতো দেখতে কাঠের তৈরি এই যন্ত্রের মাধ্যমে পশুশক্তির সাহায্যে কুয়ো বা খাল থেকে জল তোলা যেত। তবে যন্ত্রটি দামি হওয়ায় ভারতীয় কৃষকসমাজে এটি খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কুয়ো অঞ্চলে এটি ব্যবহার হতো।

কৃষিক্ষেত্রে মধ্যযুগের সবথেকে বড়ো উন্নতির দিক ছিল সেচব্যবস্থার প্রসার। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর শাসকরা এবং উত্তর ভারতে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং মুঘল বাদশাহরা সেচ ব্যবস্থার খুব উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জমি পাথুরে এবং নদীর সংখ্যা তুলনায় কম হওয়ার ফলে সেচের কাজ করা ছিল কঠিন। এখানে বড়ো মাপের জলাধার খনন করে তার থেকে ছোটো নালা বা খালের মাধ্যমে চাষের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হতো। অন্যদিকে উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছোটো বড়ো নদীর সংখ্যা অনেক। এই নদীগুলি থেকে খালের মাধ্যমে জল সরাসরি পৌঁছে যেত চাষের জমিতে।



ছবি ৭.৩১ : একটি আধুনিক গিয়ার-লাগানো সার্কিয়া বা পারসিক চক্র।

মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি বিকাশের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল ঘর-বাড়ি নির্মাণশিল্প। সুলতানদের বানানো শহরগুলিতে এর প্রমাণ আছে। বাঁকানো খিলান, গম্বুজ, চুনের ব্যবহার ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মুঘল যুগেও এই ধারা বজায় ছিল। এই শিল্পে ভারতীয় কারিগর এবং তুর্কি স্থপতিরা মিলেমিশে ইন্দো-মুসলিম নির্মাণরীতির জন্ম দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ভারতে অনেক নতুন প্রযুক্তিই এসেছিল চিন, পারস্য বা ইউরোপের মতো নানা অঞ্চল থেকে। ভারতীয় কারিগরেরা এইসব প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনে সহজেই। কখনওবা এগুলিতে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তোলে। তবে এই সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মৌলিক অবদান বিশেষ দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার আসে এবং তার ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশ বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। তেমন কিছু আমরা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় লক্ষ করি না। এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে, ভূগোল, ভৌতিকজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং সামরিক প্রযুক্তিতে এই সময়ে ইউরোপে, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপে, দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল। মূলত তারই সুবাদে ইউরোপের পক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়।

ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১. শূন্যস্থান পূরণ করো:

- (ক) _____ (টালি এবং ইঁট/সিমেন্ট এবং বালি/শ্বেতপাথর) ব্যবহার করে বাংলায় সুলতানি এবং মুঘল আমলে সাধারণ লোকের বাড়ি বানানো হতো।
- (খ) কবীরের দুই পংক্তির কবিতাগুলিকে বলা হয় _____ (ভজন/কথকথা/দোহা)।
- (গ) সুফিরা গুরুকে মনে করত _____ (পির/মুরিদ/বে-শরা)।
- (ঘ) _____ (কলকাতা/নববীপ/মুর্শিদাবাদ) ছিল চৈতন্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।
- (ঙ) _____ (নানক/কবীর/মীরাবাঈ) ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর সাধিকা।
- (চ) দীন-ই-ইলাহি-র বৈশিষ্ট্য ছিল মুঘল সম্রাট এবং তাঁর অভিজাতদের মধ্যে _____ (গুরু-শিষ্যের/মালিক-শ্রমিকের/রাজা-প্রজার) সম্পর্ক।
- (ছ) শ্বেতপাথরের রঁজ বসিয়ে কানুকার্য করাকে বলে _____ (চাহার বাগ/পিয়েত্রো দুরা/টেরাকোটা)।
- (জ) মহাভারতের ফারসি অনুবাদের নাম _____ (হমজানামা/তুতিনামা/রজমনামা)।
- (ঝ) (দসবন্ত/মির সঙ্গে আলি/আবদুস সামাদ) _____ পরিচিত ছিলেন ‘শিরিনকলম’ নামে।
- (ঞ) জোনপুরি রাগ তৈরি করেন _____ (বৈজু বাওরা/হোসেন শাহ শরকি/ইব্রাহিম শাহ শরকি)।
- (ট) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লেখকের নাম _____ (কাশীরাম দাস/কৃত্তিবাস ওবা/মালাধর বসু)।
- (ঠ) ‘পারসিক চক্র’ কাজে লাগানো হতো _____ (জল তোলার জন্য/কামানের গোলা ছোড়ার জন্য/বাগান বানানোর জন্য)।

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

- (ক) বিবৃতি : নদীর ধারে শিঙ্গগুলি তৈরি হতো।

ব্যাখ্যা-১ : নদীর ধারে শিঙ্গ তৈরি করলে কর লাগতো না।

ব্যাখ্যা-২ : সেকালে সব মানুষই নদীর ধারে থাকতো।

ব্যাখ্যা-৩ : কাঁচা মাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধা হতো।

- (খ) বিবৃতি : চৈতন্য বাংলা ভাষাকেই ভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি শুধু বাংলা ভাষাই জানতেন।

ব্যাখ্যা-২ : সে কালের বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।

ব্যাখ্যা-৩ : ভক্তি বিষয়ক সব বই বাংলায় লেখা হয়েছিল।

(গ) বিবৃতি : চিশ্তি সুফিরা রাজনীতিতে যোগ দিতেন না।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে ঈশ্বর-সাধনা সন্তুষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা-২ : তাঁরা রাজনীতি বুঝতেন না।

ব্যাখ্যা-৩ : তাঁরা মানবদরদী ছিলেন।

(ঘ) বিবৃতি: আকবর দীন-ই-ইলাহি প্রবর্তন করেন।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

(ঙ) বিবৃতি : মুঘল সন্ধাটোরা দুর্গ বানাতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-১ : দুর্গ বানানোর খরচ ছিল কম।

ব্যাখ্যা-২ : দুর্গ বানানো ছিল প্রাসাদ বানানোর চেয়ে সহজ।

ব্যাখ্যা-৩ : দুর্গ বানানোয় সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হতো।

(চ) বিবৃতি : জাহাঙ্গিরের আমলে ইউরোপীয় ছবির প্রভাব মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : এই সময়ে ইউরোপীয় ছবি মুঘল দরবারে আসতে শুরু করেছিল।

ব্যাখ্যা-২ : মুঘল শিল্পীরা সবাই ছিলেন ইউরোপীয়।

ব্যাখ্যা-৩ : ভারতীয় শিল্পীরা এই সময় ইউরোপ থেকে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন।

(ছ) বিবৃতি : মধ্য যুগের মণিপুরী নৃত্যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন প্রধান চরিত্র।

ব্যাখ্যা-১ : ভারতে নৃত্যের দেব-দেবী হলেন কৃষ্ণ এবং রাধা।

ব্যাখ্যা-২ : এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে বিস্তার লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : চেতন্যদের ছিলেন মণিপুরের লোক।

(জ) বিবৃতি : ভারতে প্রাচীন কালে তালপাতার উপরে লেখা হতো।

ব্যাখ্যা-১ : সে আমলে কাগজের ব্যবহার জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা-২ : সে আমলে ভারতে কাগজের দাম খুব বেশি ছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : সে আমলে ভারতীয়রা কাগজের উপরে লেখার কালি আবিষ্কার করতে পারেনি।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) সুলতান ও মুঘল যুগে ভারতে কোন কোন ফল, সবজি এবং শস্যের চাষ সবচেয়ে বেশি হতো ?

(খ) মধ্য যুগের ভারতে ভক্তি সাধক-সাধিকা কারা ছিলেন ?

(গ) সিলসিলা কাকে বলে ? চিশ্তি সুফিদের জীবনযাপন কেমন ছিল ?

(ঘ) দীন-ই-ইলাহি-র শপথ প্রহণ অনুষ্ঠান কেমন ছিল ?

(ঙ) স্থাপত্য হিসাবে আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য কী ?

(চ) ক্যালিগ্রাফি এবং মিনিয়েচার বলতে কী বোঝায় ?

(ছ) শিবায়ন কী ? এর থেকে বাংলার কৃষকের জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

(জ) কাগজ কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল ? মধ্য যুগের ভারতে কাগজের ব্যবহার কেমন ছিল তা জেখো।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

- (ক) মধ্য যুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা লেখো।
- (খ) কবীরের ভক্তি ভাবনায় কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল বলে তোমার মনে হয় ?
- (গ) বাংলায় বৈমুব আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল বিশ্লেষণ করো।
- (ঘ) বাদশাহ আকবরের দীন-ই-ইলাহি সম্বন্ধে একটি চিকা লেখো।
- (ঙ) মুঘল সম্রাটদের আমলে বাগান তৈরি এবং দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করো।
- (চ) মধ্য যুগের বাংলার স্থাপত্যরীতির পর্যায়গুলির মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল ?
- (ছ) মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতিতে মুঘল বাদশাহদের কী ভূমিকা ছিল ?
- (জ) মধ্য যুগের ভারতে কীভাবে ফারসি ভাষার ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বেড়েছিল তা বিশ্লেষণ করো।
- (ঝ) সুলতানি এবং মুঘল আমলে সামরিক এবং কৃষি প্রযুক্তিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয় ?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

- (ক) রাজনীতি, জীবনযাপন এবং ধর্ম নিয়ে একজন সুহরাবর্দি সুফি সাধকের সঙ্গে কবীরের কাল্পনিক সংলাপ লেখো।
- (খ) মনে করো তুমি চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি দেখলে চৈতন্যদেব নগরসংকীর্তনে বেরিয়েছেন। তুমি কী করবে ?
- (গ) যদি তুমি মুঘল কারখানার একজন চিত্রশিল্পী হতে তা হলে বাদশাহের সুনজরে পড়ার জন্য তুমি কী কী ছবি আঁকতে ?
- (ঘ) ধরো তুমিই আজ তোমার শ্রেণির শিক্ষিকা/শিক্ষক। তুমি বাংলা ভাষায় আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পড়াচ্ছ। রোজকার বাংলা কথাবার্তায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি তালিকা তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে চাও। এমন একটি তালিকা তুমি তৈরি করো। দরকারে একটি বাংলা অভিধানের সাহায্য নাও।

৫ বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।



পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট



৮.১. গোড়ার কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট বুঝতে হলে কেন এই সংকট তৈরি হয়েছিল তা জানা দরকার। তার জন্য এই সময়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। ওরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্য অনেক বড়ে হয়ে পড়েছিল এবং মনসব নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে দণ্ড শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে মারাঠাদের মতো এক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এরা মুঘলদের সার্বভৌমত্বকে অস্থীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে মুঘলরা নিজেদের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ধারণায় আগাত করা হয়। এই অধ্যায়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রতিরোধের কথাই আমরা পড়ব।

এই প্রতিরোধগুলির চরিত্র ছিল এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। মারাঠারা নিজেদের স্বরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। জাঠ এবং সৎনামি বিদ্রোহ মুঘল আমলে কৃষিব্যবস্থার সংকটের দিকটি তুলে ধরেছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতা এরা সকলেই চেয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলিকে ধর্মীয় প্রতিরোধ বলা কিন্তু ঠিক নয়।

৮.২. শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

যুদ্ধপুর মারাঠাদের বাস ছিল পুণে এবং কোকণ অঞ্চলে। তারা অনেকেই বিজাপুর এবং গোলকোংডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিল। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজি মারাঠাদের জোটবদ্ধ করেছিলেন।

শিবাজির (জীবনকাল ১৬৩০-৮০ খ্রিঃ) বাবা শাহজি ভেঁসলে বিজাপুরের সুলতানের জায়গিলাল ছিলেন। শিবাজি তাঁর মা জিজাবাঈ এবং শিক্ষক দাদাজি কোঁড়দেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি বিজাপুরের বেশ কিছু জমিদারকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। সুলতান শিবাজিকে দমন করতে আফজল খানকে পাঠান। আফজল খান শিবাজিকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সতর্ক শিবাজি উল্টে বাঘনখন নামের একটি অস্ত্র দিয়ে আফজল খানকেই হত্যা করেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি



ছবি ৮.১ : বাঘ নখ

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଓରଙ୍ଗଜେବେର ପକ୍ଷେ ମେନେ ନେଓଯା ସନ୍ତ୍ବ ଛିଲ ନା । ଶିବାଜି ଦୁଃଖର ବନ୍ଦରନଗରୀ ସୁରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଲୁଠପାଟ କରେନ । ଓରଙ୍ଗଜେବ ଶିବାଜିକେ ଦମନ କରତେ ଶାଯେଷ୍ଟା ଖାନ, ମୁୟାଜ୍ଜମ ଏବଂ ମିର୍ଜା ରାଜା ଜ୍ୟସିଂହକେ ପାଠାନ । ଜ୍ୟସିଂହ ୧୬୫୫ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ଶିବାଜିକେ ପୁରାନ୍ତରେର ସନ୍ଧି ସ୍ଵାକ୍ଷର କରତେ ବାଧ୍ୟ କରେନ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିବାଜି ମୁଘଲଦେର ୨୩ଟି ଦୁର୍ଗ ଛେଡ଼େ ଦିତେ ବାଧ୍ୟ ହନ । ମନେ ରେଖୋ, ସେ ଯୁଗେ ଦୁର୍ଗ ଛିଲ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷାର ପ୍ରଥାନ ସ୍ତନ୍ତ । ଏରପର ଶିବାଜି ଆଥାର ମୁଘଲ ଦରବାରେ ପୌଛିଲେ ତାକେ ଅପମାନ କରା ହୟ । ତାକେ ଆଥା ଦୁର୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରା ହୟ । ଶିବାଜି ଏକଟି ଫଳେର ଝୁଡ଼ିତେ ଲୁକିଯେ ସେଖାନ ଥେକେ ପାଲିଯେ ଆସେନ । ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟେ ପୌଛେ ମୁଘଲଦେର ସଙ୍ଗେ ଆବାର ଶିବାଜିର ଦନ୍ତ ଶୁରୁ ହୟ ।



ଶିବାଜିର ନେତୃତ୍ବେ ମାରାଠାଦେର ଉତ୍ଥାନ ଛିଲ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଏକଟି ବଡ଼ୋମଡ଼ୋ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଶିବାଜି ଏକଟି ସୁପରିକଞ୍ଜିତ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନ ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା କରେନ । ରାଯଗଡ଼େ ତାର ଅଭିଷେକ ହୟ (୧୬୭୪ ଖ୍ରିୟ) । ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାଠା ସର୍ଦାରଦେର ଥେକେ ତିନି ଯେ ଆଲାଦା ସେଟାଇ ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ । ତାର ଆଟଙ୍ଗନ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ବଲା ହତୋ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ । ଏହିରେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥାନ ଛିଲେନ ପେଶାଯା । ମାରାଠାରା ନିଜେଦେର ରାଜ୍ୟକେ ବଲତ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ । ସ୍ଵରାଜ୍ୟର ବାହିରେ ମାରାଠା ସେନାରା ଆଶପାଶେର ମୁଘଲ ଏଲାକାଗୁଲି ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେଖାନ ଥେକେ କର ଆଦାୟ କରତ । ଯେବେ ସୈନିକ ମାରାଠା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାଯୀଭାବେ ଚାକରି କରତ ତାଦେର ବଲା ହତୋ ବର୍ଗି । ଶିବାଜିର ନେତୃତ୍ବେ ମାରାଠାଦେର ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜେଗେ ଓଠେ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ମାଘଲେ ୩ ପେଶାଯା

ଶିବାଜି ଏକ ସମୟ ପୁଗେର ଆଶପାଶେର ଅଣ୍ଣଲଗୁଲି ଆକ୍ରମଣ କରାଛିଲେନ । ତଥନ ତିନି ମାଓୟାଲ ଅଣ୍ଣଳ ଥେକେ ଏକ ଦଲ ପଦାତିକ ସେନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଯୋଗ କରେନ । ଏହିରେ ବଲା ହତୋ ମାବଲେ ବା ମାଓୟାଲି । ଏରା ତାର ସେନାବାହିନୀର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳ୍ଯ ଛିଲ ।

ଶିବାଜିର ମୃତ୍ୟୁର ଚଲିଶ ବଚର ପରେ ପେଶାଯାଦେର ହାତେଇ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଚଲେ ଆସେ । ତଥନ ମୁଘଲ ଶାସନେର ବଡ଼ୋଇ ଦୁର୍ଦିନ । ଶିବାଜିର ମୃତ୍ୟୁର ପଣ୍ଡଶ ବଚର ପରେ ପେଶାଯା ପ୍ରଥମ ବାଜୀରାଓ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୟେ ଏକଟି ହିନ୍ଦୁ ସାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼େ ତୋଳାର ପରିକଳ୍ପନା କରେନ । ତାର ଏହି ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶକେ ବଲା ହୟ ହିନ୍ଦୁପାଦପାଦଶାହି । ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଚାଇଲେନ ଧର୍ମେର ନାମେ ମୁଘଲଦେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅନ୍ୟ ରାଜାଦେର ଜୋଟବଦ୍ୟ କରତେ ।

মানচিত্র ৮.১ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত



শিখ শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের আমলে মুঘলদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে অনেক সময় মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেঁধে যেত। খ্রিস্টীয় যোড়শ শতকের শেষের দিকে চতুর্থ গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনদেব শিখদের গুরু হন। এই সময় থেকেই শুরু হলো বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন করা। গুরু অর্জুনের ছেলে গুরু হরগোবিন্দ একসঙ্গে দুটি তলওয়ার নিতেন। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর আছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছ, শিখদের উত্থান অনেকটাই একটা স্বাধীন শক্তির উত্থানের মতোই হয়ে

ଉଠେଛିଲ । ମୁଘଲ ସରକାରେର ପକ୍ଷେ ତା ମେନେ ନେଓଯା ସନ୍ତ୍ଵବ ଛିଲ ନା । ନବମ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗବାହାଦୁର ଓରଙ୍ଗଜେବେର ଧର୍ମୀୟ ନିତିର ବିରୋଧିତା କରେନ । କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମୀୟ କାରଣେଇ ମୁଘଲ-ଶିଖ ସଂଘାତ ହୟନି । ଏ କଥାଓ ପ୍ରଚଳିତ ଯେ ତେଗବାହାଦୁର ଏକ ପାଠାନେର ସଙ୍ଗେ ହାତ ମିଲିଯେ ପାଞ୍ଚାବେ ମୁଘଲ ଶାସନେର ବିରୋଧିତା କରେଛିଲେନ । ତେଗବାହାଦୁରକେ ବନ୍ଦୀ କରେ ମୁଘଲରା ହତ୍ୟା କରେ । ଏହି ସଟନାର ପର ଶିଖରା ପାଞ୍ଚାବେର ପାହାଡ଼ି ଏଲାକାଯ ଚଲେ ଯାଯ ଏବଂ ସେଖାନେଇ ଦଶମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହେର ନେତୃତ୍ବେ ତାରା ସଞ୍ଜେବଦ୍ୱ ହୟ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ଖାଲସା

୧୬୯୯ ଖିସ୍ଟାବେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଖାଲସା ନାମକ ଏକଟି ସଂଗଠନ ତୈରି କରେନ । ଖାଲସାର କାଜ ଛିଲ ଶିଖଦେର ନିରାପଦେ ରାଖା । ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିଖଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେର ଅଞ୍ଗ ଛିଲ । ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଶିଖଦେର ‘ପଞ୍ଚ’ ବା ପଥ ଠିକ କରେ ଦେନ । ଗୁରୁ ତାଦେର ପାଁଚଟି ଜିନିସ ସବସମୟ କାହେ ରାଖିତେ ବଲେନ । ଏହି ପାଁଚଟି ଜିନିସେର ନାମଟି ‘କ’ ଅକ୍ଷର ଦିଯେ ଶୁରୁ । ଏଗୁଲି ହଲୋ—କେଶ, କଞ୍ଚା (ଚିରୁନି), କଚ୍ଛା, କୃପାଗ ଏବଂ କଡ଼ା । ଏହାଡ଼ାଓ ଖାଲସାପଞ୍ଚି ଶିଖରା ‘ସିଂହ’ ପଦବି ବ୍ୟବହାର କରତେ ଶୁରୁ କରଲ । ପାହାଡ଼ି ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଦେର ସଙ୍ଗେ ଶିଖଦେର ମାଝେ ମଧ୍ୟେଇ ଛୋଟୋଖାଟୋ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲତ । ଶିଖଦେର ବିବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ସମୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାରା ମୁଘଲ ସରକାରେର ସାହାଯ୍ୟ ଚେଯେଛିଲ । ମୁଘଲଦେର ପକ୍ଷେ ଶିଖ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଉଥାନ ମେନେ ନେଓଯା ସନ୍ତ୍ଵବ ଛିଲ ନା । ତାହିଁ ଓରଙ୍ଗଜେବେର ସଙ୍ଗେ ଶିଖଦେର ସଂଘାତର ଚରିତ୍ର ଛିଲ ମୂଲତ ରାଜନୈତିକ । ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହେର ମୃତ୍ୟୁ ପର ତାର ଶିଷ୍ୟ ବାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଲଡ଼ାଇ ଚାଲିଯେ ଯାନ ।

ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ମୁଘଲଦେର ବିବୁଦ୍ଧେ ଜୟି ହତେ ପାରେନନି ଠିକଇ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର-ପାଞ୍ଚମ ସୀମାଟେ ମୁଘଲଦେର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଶିଥିଲ ହୟେ ଗିଯେଛିଲ । ଶିଖ ଧର୍ମୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ସମତାର କଥା ବଲତ । ତବେ ଅନେକ ସମୟ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୟେ ଏହି ଏକଟି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବେ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନିତ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରେକଟି ବିଦ୍ରୋହ

ଦିଲ୍ଲି-ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳେର ଜାଠରା ଛିଲ ପ୍ରଧାନତ କୃଷକ । ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେ ଆବାର ଜମିଦାରଓ ଛିଲ । ରାଜସ୍ଵ ଦେଓଯା ନିଯେ ଜାହାଙ୍ଗିର ଓ ଶାହଜାହାନେର ଆମଲେ ତାଦେର ସଙ୍ଗେ ମୁଘଲଦେର ସଂଘାତ ହତୋ । ଓରଙ୍ଗଜେବେର ଆମଲେ ତାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଜମିଦାରେର ନେତୃତ୍ବେ ଜୋଟବଦ୍ୱ ହୟେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ । ଜାଠରା ଏକଟି ପୃଥିକ

রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিল। মুঘলদের বিরুদ্ধে জাঠ প্রতিরোধ ছিল একদিকে কৃষক বিদ্রোহ অন্যদিকে একটি আলাদা গোষ্ঠীপরিচয়ে জাঠরা একজোট হচ্ছিল। মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। এরা ছিল সংনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বেরাচার-বিরোধী আন্দোলন। তাছাড়া উরঙ্গজেবের সময় থেকে কৃষি সংকটও বেড়ে গিয়েছিল। সেটিও ছিল এই বিদ্রোহগুলির একটি কারণ।

৮.৩ জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : কারণ ও প্রভাব

শাহ জাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনসবদারদের তাদের পদ অনুযায়ী যা বেতন পাওয়ার কথা, তা দেওয়া যেত না। অনেক সময় আবার কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায় করা যেত না। এছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হচ্ছিল না। মনসবদারেরা বেতন না পেলে তাদের যতজন ঘোড়সওয়ারের দেখাশোনা করার কথা, ততজনের দেখাশোনা করা যেত না। অর্থাৎ খাতায় কলমে হিসাবের সঙ্গে আসলে যা হচ্ছে, তার তফাত বেড়েই চলেছিল। উরঙ্গজেবের সময় এই সমস্যা আরও বেড়েছিল।

জায়গিরদারি এবং মনসবদারি সংকটের সঙ্গে যুক্ত সে যুগের কৃষি সংকট। এই সময় ফসলের উৎপাদন বেড়েছিল। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুঘল মনসবদাররা মারাঠা সর্দারদের সাহায্যও নিত। তার মানে ঐ সব অঞ্চলে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে খিস্তীয় সপ্তদশ শতকে আবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে অভিজাতরা চাইলেন জমি থেকে তাদের আয় আরও বাড়াতে। তারা জমিদার এবং কৃষকদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। কৃষকরাও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। অনেক সময় জমিদাররাও তাদের মদত দিত।

কোনো কোনো সময়ে কৃষকরা রাজস্ব না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। তখন তাদের জমিতে চাষ হতো না। চাষ না হলে রাজস্ব আদায় করা যাবে না। তাই যে সব মনসবদার এই সব জমিতে জায়গির পেত, তারাও ভালোভাবে ঘোড়সওয়ারের ভরণপোষণ করতে পারত না।

উরঙ্গজেব বিজাপুর এবং গোলকোংড়া জয়ের পর দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল মুঘলদের হাতে এসেছিল। এ অঞ্চলের সব থেকে ভাল জমিগুলি



ভেবে বলতো কৃষি
সংকট বলতে কী বোঝায়?

টুকরো কথা

মুঘল দণ্ডাবে দলাদলি

সপ্তদশ শতকের শেষে মনসবদারদের মধ্যে ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য বড়যন্ত্র ও লড়াই শুরু হলো। দরবারি রাজনীতিতে ইরানি, তুরানি, মারাঠা, রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। মনসবদারি এবং জায়গিরদারি সংকটের জন্য কোনো একজন মুঘল শাসক দায়ী ছিলেন না। অনেকদিন ধরে নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওই সংকট তৈরি করেছিল।

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରେସର୍



ବଲୋ ତୋ ଭାଲୋ ଜମିଗୁଣି
କେନ ସନ୍ତ୍ରାଟ ଓରଙ୍ଗଜେବ
ଖାସ ଜମି କରେ
ରେଖେଛିଲେନ ?



ଓରଙ୍ଗଜେବ ଖାସ ଜମି ବା ଖାଲିସା ହିସାବେ ରେଖେଛିଲେନ । ସେଗୁଳି ଜାୟଗିର ହିସାବେ ଦେଓଯା ହତୋ ନା । ଖାସ ଜମିର ରାଜସ୍ଵ ସରାସରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଷାଗାରେ ଜମା ହତୋ । ସୁତରାଂ, ଜମିର ଅଭାବ ଛିଲ ନା ତବେ ଜାୟଗିର ହିସାବେ ଦେଓଯା ଯାଏ, ଏରକମ ଭାଲୋ ଜମିର ପରିମାଣ କମେ ଗିଯେଛିଲ । ମୁଘଲ ଶାସକେରା ନତୁନ ପ୍ରୟୁକ୍ଷିର ବ୍ୟବହାର କରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବାଡ଼ାତେ ପାରେନାନି । ଫଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆରୋ ଗଭୀର ହେଯେଛିଲ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ମୁଘଲ ଜାନ୍ମାଜ୍ୟର ଚାରିତ୍ର

ମୁଘଲ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟ କଟଟା ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଛିଲ, ତା ନିଯେ ଐତିହାସିକଦେର ମଧ୍ୟେ ତୁମୁଳ ବିତରକ ଆଛେ । ଏକ ଦଲ ଐତିହାସିକ ମନେ କରେନ ଯେ ମୁଘଲରା ଛିଲ ଦାରୁଣ ବଳଶାଲୀ । ତାଦେର ତୈରି କରା ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟେଇ ଲୁକିଯେ ଛିଲ ବର୍ତମାନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୀଜ । ଆସମୁଦ୍ରାହିମାଚଲେ ଛଢିଯେ ଛିଲ ମୁଘଲଶକ୍ତିର କ୍ଷମତା । ଆରେକ ଦଲ ଐତିହାସିକ ମନେ କରେନ ଯେ ମୋଟେ ମୁଘଲରା ଏତଟା କ୍ଷମତା ରାଖିତ ନା । ତାଦେର ଏକଜନେର ମତେ ମୁଘଲ ସାନ୍ତ୍ରାଜ୍ୟକେ ଏ-ଦେୟାଳ ଥେକେ ଓ-ଦେୟାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏକଟି ନିଶ୍ଚିଦ୍ର ଗାଲିଚାର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରା ଉଚିତ ନର । ବରଂ ମୋଟାମୁଦ୍ରିଭାବେ ଜୋଡ଼ାତାଲି ଦେଓଯା ଏକଟା କଞ୍ଚଳ ହିସେବେଇ ଭାବା ଠିକ ହବେ । ଉତ୍ତର ଭାରତେ ମୁଘଲଦେର ଆଧିପତ୍ୟ ଥାକଲେଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳେ ତାଦେର କ୍ଷମତା ଛିଲ ସୀମିତ ।

ଶ୍ରୀ ଚ.୧ : ମୁଘଲ ସେନାପତି ଶାଯେଷ୍ଟା ଖାନେର ଶିବାଜିର ଅତର୍କିତ ହାମଦାର ଦୃଶ୍ୟ । ଜାନାଲା ଦିଯେ ପାଲାନୋର ସମୟ ଶାଯେଷ୍ଟା ଖାନେର ହାତେର ଆଙ୍ଗଳ ଶିବାଜିର ତଳଗ୍ରହାରେ କୋପେ କାଟା ଯାଏ । ଘଟନାର ସ୍ଥାନ ପୁଣେ, ସମୟ ୧୬୬୦ ଖିଃ ।



ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১. নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

- (ক) পুণে, কোঙ্কণ, আগ্রা, বিজাপুর।
- (খ) বাল্মী বাহাদুর, আফজল খান, শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম।
- (গ) অষ্ট প্রধান, বর্গি, মাবলে, খালসা।
- (ঘ) রামদাস, তেগবাহাদুর, জয়সিংহ, হরগোবিন্দ।
- (ঙ) কেশ, কৃপাণ, কলম, কঙ্ঘা।

২. ‘ক’ স্তুতের সঙ্গে ‘খ’ স্তুত মিলিয়ে লেখো:

| ‘ক’ স্তুত | ‘খ’ স্তুত |
|------------------|----------------------|
| রায়গড় | নারনৌল |
| হিন্দুপাদপাদশাহি | শিবাজি |
| গোলকোড়া | উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত |
| সংনামি | প্রথম বাজীরাও |
| পাঠান উপজাতি | দাক্ষিণাত্য |

৩. সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:

- (ক) ওরঙ্গজেবের শাসনকালে কী কী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল ?
- (খ) কবে, কাদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি হয়েছিল ? এই সন্ধির ফল কী হয়েছিল ?
- (গ) জাঠদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত কেন বেঁধেছিল ?
- (ঘ) শিবাজির সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল ?
- (ঙ) বিজাপুর ও গোলকোড়া জয়ের ফলে মুঘলদের কী সুবিধা হয়েছিল ?

৪. বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:

- (ক) মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখরা কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছিল ?
- (খ) মুঘল যুগের শেষ দিকে কৃষি সংকট কেন বেড়ে গিয়েছিল ? এই কৃষি সংকটের ফল কী হয়েছিল ?
- (গ) মুঘল যুগের শেষ দিকে জায়গিরাদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থায় কেন সংকট তৈরি হয়েছিল ? মুঘল সাম্রাজ্যের উপর এই সংকটের কী প্রভাব পড়েছিল ?
- (ঘ) সমাট ওরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে তোমার মতামত কী ?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

- (ক) ধরো তুমি একজন মারাঠা সর্দার। তোমার সঙ্গে একজন জাঠ কৃষকের দেখা হয়েছে। মুঘল শাসনের নানা দিক নিয়ে ঐ জাঠ কৃষকের সঙ্গে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।
- (খ) ধরো তুমি সন্ধাট ওরঙ্গজেবের দরবারের একজন ঐতিহাসিক। তুমি মারাঠা, শিখ, জাঠ ও সংনামিদের লড়াইয়ের ইতিহাস লিখছো। কীভাবে তুমি তোমার লেখায় এই লড়াইগুলির ব্যাখ্যা করবে?
- (গ) ধরো তুমি একজন অভিজাত জায়গিরদার। প্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তোমার সঙ্গে তোমার জমির কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে একটি সংলাপ লেখো।

৫ বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।



নথম অধ্যায়

আজক্ষের ভারত

সরবরাহ, গণতন্ত্র ও স্বায়ভিশাসন



এ তক্ষণ যা যা পড়া হলো, সেসব ছিল পুরোনো দিনের কথা। কিন্তু, সেই পুরোনো অনেক কিছুর ছাপ এখনও আমাদের উপরে পড়ে। পুরানো দিনের অনেক শব্দ এখনও আমরা ব্যবহার করি। পুরোনো দিনের অনেক ধারণা এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে। শুধু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধারণাগুলি আরও বদলেছে মাত্র। তবে তার ভেতরের মূলকথাটা অনেক ক্ষেত্রে একই রয়ে গেছে।

তেমনই একটা ধারণা ‘সরকার’। সরকার শব্দটা ফারসি থেকে এসেছে। মধ্যযুগে ভারতে এই শব্দটির মানে শাসনকর্তা বা শাসনব্যবস্থা—দুই হতো। এই সরকার শব্দটা আজও আমরা ব্যবহার করি। ইংরেজিতে এর সমান শব্দ হলো Government (গভর্নমেন্ট)। Govern মানে শাসন করা।

আমরা যে দেশে এখন বাস করি, সেই ভারতেও একটা সরকার আছে। সব স্বাধীন দেশেই সরকার থাকে। আগে ক্ষমতার জোরে যুদ্ধে জিততেন যিনি, তিনিই শাসন করতেন। এখন দেশের লোকেরা নিজেরা ঠিক করেন কে বা কারা দেশশাসন করবে। নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নেওয়ার এই পদ্ধতিকেই বলে ‘গণতন্ত্র’। ‘তন্ত্র’ মানে ব্যবস্থা। লোকজন বা জনগণ নিজেরাই দেশের তন্ত্র বা ব্যবস্থা ঠিক করেন বলেই এটা গণতন্ত্র। এইভাবে জনগণ যাদের বেছে নেন দেশ চালাবার জন্য, তারা মিলেই হয় সরকার।

মনে রেখো

এর আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা রাজা, সুলতান, বাদশাহের কথা পড়েছি। তাদের শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এখনও কোনো কোনো দেশে রাজা-রানি আছেন। যেমন ইংল্যান্ড, জাপান। তবে সেসব দেশেও গণতান্ত্রিক সরকার আছে। জনগণ সেখানে নিজেরাই সরকার বেছে নেন। ভারতে রাজা-রানি নেই। এখানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আছেন।

প্রত্যেক দেশ কীভাবে চলবে তার নিয়মকানুন আছে। এই নিয়মকানুনকেই ‘সংবিধান’ বলা হয়। ‘বিধান’ শব্দটার মানেই নিয়ম। বেশিরভাগ দেশেরই সংবিধান আছে লিখিত আকারে। আবার কোনো কোনো দেশে তা লেখা নেই। সেখানে বহু বছর ধরে চলে আসা নিয়মগুলোই মেনে নেওয়া হয়।



বলোতো অনেক আগে বাংলায় একবার প্রজারাই তাদের রাজাকে বেছে নিয়েছিলেন। কে সেই রাজা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান

ছবি ৯.১ :



ড. বি. আর. আমেদকর

জন্ম : ১৮৯১খ্রি:

মৃত্যু : ১৯৫৬খ্রি:



ভারতীয় সংবিধান

ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে। ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংবিধান। এত ধারা-উপধারা আর কোনো দেশের সংবিধানে নেই। এই সংবিধানের প্রধান বৃপ্তিকার ড. বি. আর. আমেদকর। ভারতীয় সংবিধানে দেশের সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের অধিকারকেই স্বীকার করা আছে। সেই অধিকার মেনেই প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে দেশে একবার নির্বাচন হয়। যাকে চলতি কথায় ‘ভোট হওয়া’ বলে। সেই নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকার বেছে নেন।

টুকরো কথা

জাতীয় সংবিধান

প্রায় তিনি বছর আলোচনা-বিত্তকের পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঐ সংবিধান কার্যকর হয়। ২৬ জানুয়ারি ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ পালন করা হয়।

ভারত একটা বিশাল দেশ। এই দেশে একটাই কেন্দ্রীয় সরকার আছে। আবার প্রতিটা রাজ্যের নিজস্ব সরকার আছে। তাদের বলা হয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুটোই জনগণ বেছে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচন করেন দেশের সমস্ত জনগণ। রাজ্য সরকারকে নির্বাচন করেন ঐ রাজ্যের বাসিন্দারা।

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দুয়েরই কী কী ক্ষমতা, তা বলা আছে। যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-রকম সরকারের ক্ষমতাই স্বীকার করা হয়, তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। ফলে, ভারতের সরকার একদিকে গণতান্ত্রিক— কারণ জনগণ নিজেরা শাসক বেছে নেন। আবার অন্যদিকে তা যুক্তরাষ্ট্রীয়— কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-ধরনের সরকারই এই শাসনব্যবস্থায় আছে।

‘সরকার’ ধারণাটি তার কাজের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, সরকারের কাজ কী— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। খুব সাধারণভাবে বললে, সরকারের কাজ হলো দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জনগণের যাতে ভালো হয় তার জন্য নানান উদ্যোগ নেওয়া, কর সংগ্রহ করা, দেশের স্বাধীনতা বজায়, রাখা। দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য সরকার কাজ করবে। আর এইসব কাজে সরকারকে পথ দেখাবে সংবিধান। সংবিধান মেনেই সরকার দেশ শাসন করবে।

সরকারের কাজকর্মকে চালানোর জন্য তিনটি বিভাগ করা হয়েছে। আইন বিভাগ, যেখানে দেশ পরিচালনার আইন তৈরি হবে। শাসন বিভাগ, ঐ আইন অনুসারে যারা দেশ পরিচালনা করবে। বিচার বিভাগ, সংবিধান অনুসারে দেশ



ଶାସନ ହଚ୍ଛ କିନା, ଜନଗଣେର ସ୍ଵାର୍ଥ ରକ୍ଷା ହଚ୍ଛ କିନା—ଏସବେର ପ୍ରତି ନଜର ରାଖିବେ ।
ଆର କେଉ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗଲେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଓଯାଓ ବିଭାଗେର କାଜ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ଭାରତୀୟ ବିଭାଗ

ସବ ଦେଶେଇ ବିଭାଗକେ ବାକି ଦୁଟି ବିଭାଗେର (ଆଇନ ଓ ଶାସନ) ଥେକେ ଆଲାଦା ରାଖା ହୁଏ । କୋନୋଭାବେଇ ଯାତେ ସୁବିଚାରେର ପଥ ବନ୍ଧ ନା ହୁଏ, ତାର ଜନ୍ୟଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏକକଥାଯା ଏକେ ବଲେ ‘କ୍ଷମତା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରୀକରଣ ନୀତି’ / ‘ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରୀକରଣ’ ମାନେ ଆଲାଦା କରା । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାତେ ବଲବନ୍ଧ ଥାକେ, ତାର ଜନ୍ୟଇ ଏହି ନୀତି ନେଓଯା ହୁଏ । ଫାନ୍ଦେର ଦାଶନିକ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମ ଏହି ନୀତିର କଥା ବଲେନ ।

ଭାରତେର ଜନଗଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶାସକ ନିର୍ବାଚନ କରେନ ନା, ନିଜେରାଓ ଶାସନେ ଅଂଶ ନେନ । ସରାସରି ଶାସନେ ଅଂଶ ନେଓଯାକେଇ ବଲେ ‘ସ୍ଵାୟନ୍ତ୍ରଶାସନ’ । ‘ସ୍ଵ’ ମାନେ ନିଜେର ଆର ‘ଆୟନ୍ତ’ ମାନେ ଅଧୀନ । ଜନଗଣ ସେଇନି ନିଜେର ଅଧୀନ ମେଳାଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ବଲେ ‘ସ୍ଵାୟନ୍ତ୍ରଶାସନ’ । ପଞ୍ଚମବଞ୍ଜେ ଏହି ସ୍ଵାୟନ୍ତ୍ରଶାସନ ଦୁଃଭାବେ ଦେଖା ଯାଏ । ଶହର ବା ନଗରେ କେତେ ପୌରସଭା, ଆର ପ୍ରାମେର କେତେ ପଞ୍ଚାଯେତ ।

ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ ଶହରେ ବା ନଗରେ ପୌରସଭା ଆଛେ । ‘ପୌର’ କଥାଟା ଏସେହେ ‘ପୁର’ ଥେକେ । ସଂକ୍ଷିତେ ପୁର ମାନେ ନଗର । ଏ ଶହର ବା ନଗରେ ଆଠାରୋ ବର୍ଷର ବା ତାର ବେଶି ବୟସେର ବାସିନ୍ଦାରା ଭୋଟ ଦିଯେ ପୌରସଭାର ସଦସ୍ୟଦେର ବେଛେ ନେନ । ଏହିଦେର ପୌରପ୍ରତିନିଧି ବଲେ । ଏହିଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ପୌରପ୍ରଧାନ ହନ । ଶହର ବା

ଛବି ୯.୨ :
ଭାରତେ ନେଓଯାକେ ବିଭାଗ କଥା



ବଲୋତୋ, ବର୍ତମାନେ
ଭାରତେ ସରକାର ଯଦି ହୁଏ
ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ,
ତାହାରେ ସୁଲତାନି ଓ ମୁଘଲ
ଯୁଗେ ଭାରତେ ସରକାର
କେମନ ଛିଲ ?

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ନଗରେ ଜନସେବା, ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଉନ୍ନଯନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏଗ୍ରଲିର ଦେଖଭାଲ କରାଇ ପୌରସଭାର କାଜ । ପାନୀୟ ଜଳ ସରବରାହ କରା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବାନାନୋ, ଦୂସଣ ରୋଧ କରା, ଏସବଇ ପୌରସଭାଗୁଲି କରେ ଥାକେ । ବିଦ୍ୟାଲୟ, ହାସପାତାଲ ପ୍ରଭୃତି ବାନିଯେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରେ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନଯନେ ପୌରସଭାଗୁଲି ଉଦ୍ୟୋଗ ନେଇ ।

ଶହର ବା ନଗରେ ପୌରସଭାର ମତୋଇ ପ୍ରାମେ ଆଛେ ପ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେତ । ପ୍ରାମେର ବମ୍ବିନ୍ଦାରା ଭୋଟ ଦିଯେ ପ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେତର ସଦୟଦେର ନିର୍ବାଚନ କରେନ । ତାଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଏକଜନ ହନ ପଞ୍ଚାୟେତ ପ୍ରଥାନ । ପ୍ରାମେର ସବରକମ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେତର କାଜ । ପାନୀୟ ଜଲେର ସରବରାହ, ପ୍ରାମେର ପରିଚନତା, ପଥ-ଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଏସବଇ ପ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେତ କରେ । ଆବାର ଶିକ୍ଷାଦାନେର ଜନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ କରା, ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ତୈରି କରା, ବନ୍ସୁଜନ କରା — ଏସବେ ପ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେତର କାଜେର ମଧ୍ୟେ ପଡ଼େ ।

ଅନେକଗୁଲି ପ୍ରାମ ନିଯେ ଏକଟା ‘ବ୍ଲକ’ ହୁଏ । ସେଇ ବ୍ଲକ୍‌କେ ଏକଇଭାବେ ଏକଟା ପଞ୍ଚାୟେତ ସମିତି ଥାକେ । ଆବାର କ୍ୟେକଟି ବ୍ଲକ୍ ନିଯେ ହୁଏ ‘ଜେଲୋ’ । ଜେଲାଯ ଥାକେ ଜେଲାପରିଷଦ । ପ୍ରାମେର ମତୋଇ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜେଲାର ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନେର ଭାବ ଥାକେ ପଞ୍ଚାୟେତ ସମିତି ଓ ଜେଲାପରିଷଦେର ଉପରେ ।

ପୌରସଭା ହୋକ ବା ପଞ୍ଚାୟେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା—ସବେତେଇ ପାଁଚ ବଚର ଅନ୍ତର ଜନଗଣ ତାଦେର ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ କରେନ । ଆବାର ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ନାନାଭାବେ ଜନଗଣ ନିଜେରାଓ ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନାନା କର୍ମସୂଚିତେ ଅର୍ଥ ନେଇ ।

ଏଭାବେଇ ଜନଗଣେର ସରାସରି ଯୋଗଦାନେର ମଧ୍ୟେ ଦିଯେଇ ଶହର ବା ନଗର ଓ ପ୍ରାମେର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜୋରଦାର ହୁଏ ଓଠେ ।



ତୁମି ପୌରସଭା ଏଲାକାଯ ଥାକେ ନା ପଞ୍ଚାୟେତ ଏଲାକାଯ ଥାକେ ? ତୋମାର ଏଲାକାଯ କି ବିଦ୍ୟାଲୟ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଛେ ? କଟଗୁଲି ଖେଲାର ମାଠ ବା ପାର୍କ ଆଛେ ? କୀଭାବେ ତୋମରା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଓ ? ବନ୍ସୁରା ସବାଇ ମିଳେ ଏସବେର ଖୋଜ ନିଯେ ନାଓ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ଗଣତନ୍ତ୍ର

ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପାରଟା କିନ୍ତୁ ନତୁନ ଧାରଣା ନୟ । ଆଜ ଥେକେ ଆଡ଼ାଇ ହାଜାର ବଚର ଆଗେର କଥା । ଗ୍ରିସ ଦେଶେ ଏଥେନ୍ୟେର ଲୋକେରା ତାଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ଶାସକ ବେଛେ ନିତ । ଶୋନା ଯାଇ ଯେ, ଲୋକେରା ଭାଙ୍ଗା କଲସିର ଟୁକରୋର ଉପର ପଛନମତୋ ଚିତ୍ତ ଏଁକେ ଆରେକଟା ଆନ୍ତରିକ କଲସିର ମଧ୍ୟେ ଫେଲେ ଦିତ । ଯାର ପକ୍ଷେ ବେଶ କଲସିର ଟୁକରୋ ଜମା ପଡ଼ିତ, ସେଇ ହତୋ ଶାସକ ।

ଏକଟା ପୃଥିବୀର ମାନଚିତ୍ର ନାଓ । ଏବାର ତାର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ଗ୍ରିସ ଓ ଏଥେନ୍ ଖୁଁଜେ ବେର କରୋ ।



ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

- (ক) (বাংলাদেশ/জাপান/ফ্রান্স) _____ এ এখনও রাজা-রানি আছেন।
 (খ) নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে _____ (গণতন্ত্র/রাজতন্ত্র/যুক্তরাষ্ট্র)।
 (গ) (ভারতের/জাপানের/ইংল্যান্ডের) _____ সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান।
 (ঘ) জনগণ যে শাসনব্যবস্থায় নিজেই নিজের অধীন, তাকে বলে _____ (সংবিধান/সভা ও সমিতি/স্বায়ত্তশাসন)।
 (ঙ) অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হয় একটা _____ (ব্লক/জেলা/পৌরসভা)।

২। ‘ক’ স্তৰের সঙ্গে ‘খ’ স্তৰ মিলিয়ে লেখো :

| ‘ক’ স্তৰ | ‘খ’ স্তৰ |
|--------------------|-----------------|
| সরকার | গ্রিস |
| ড. বি.আর. আম্বেদকর | স্বায়ত্তশাসন |
| যুক্তরাষ্ট্র | ভারতীয় সংবিধান |
| এথেন্স | ফারসি |
| জেলাপরিষদ | ভারত |

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

- (ক) বর্তমান ভারতে শাসনব্যবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ?
 (খ) যুক্তরাষ্ট্র ও সংবিধান কাকে বলে ?
 (গ) সরকারের কাজ কী কী ?
 (ঘ) স্বায়ত্তশাসন বলতে তুমি কী বোঝো ?
 (ঙ) নির্বাচনকে সাধারণ ভাবে কী বলে ? ভারতে কত বছর অন্তর সরকার নির্বাচন হয় ? সরকার নির্বাচনের সঙ্গে গণতন্ত্রের কী সম্পর্ক ?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

- (ক) ভারতকে কেন গণতন্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয় ? দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা কী বলে তুমি মনে করো ?
 (খ) সরকারের কয়টি ভাগ ? ঐ ভাগগুলি কোনটি কী কাজ করে ? বিচার বিভাগকে কেন আলাদা করে রাখা হয় ?
 (গ) পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কী কী কাজ করে ?
 (ঘ) পশ্চিমবঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি টীকা লেখো।
 (ঙ) প্রাচীনকালে ভারতে ও অন্য কোথাও গণতন্ত্রের কথা জানা যায় কী ? সেই গণতন্ত্র কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো ?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

- (ক) ধরো তুমি একজন পৌর-প্রতিনিধি/পঞ্চায়েত সদস্য। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের উন্নতি করার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বক্তৃতা পেশ কর।
- (খ) ধরো তুমি ভারতের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি তোমার অঞ্চলের উন্নতি করতে চাও। কী কী ভাবে তুমি সেই উন্নতির পরিকল্পনা করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বিতর্কের আয়োজন কর।
- (গ) ধরো পাল যুগের বাংলার একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে তোমার হঠাতে দেখা হয়ে গিয়েছে। তোমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এসব নিয়ে গল্প করছো। তোমাদের সেই কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ লেখো।

শ্র. বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো। শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।



শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সম্মত শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের জন্য অতীত ও ঐতিহ্য বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- বিগত ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠ্কলেবের বৃপ্তরেখার (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫) নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাসের (আনুমানিক স্থিস্টিয়ার সম্পূর্ণ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে এই বইতে বাংলার ইতিহাসের উপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (বিশেষত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে)।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীর প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। যেমন পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়গুলি একসঙ্গে পড়া যেতে পারে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ১০০টি ‘টুকরো কথা’ শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১১, ১৩, ১৫, ৩৯, ৫০, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ১১৮, ১১৯ এবং ১৬২ পৃষ্ঠার ‘টুকরো কথা’ অংশগুলিকে ব্যক্তিগত বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- প্রতি পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞানগুলি রাখিল। তাদের ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রাইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে দলি সুলতানির সম্মুসারণের কোনো ধারাবিবরণী না দিয়ে কেবল একটি মানচিত্রে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুটি রেখিচিত্রের সাহায্যে মধ্যযুগের ভারতের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কথা এবং ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানির আমদানি-রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- এই বইটির একটি বড়ো সম্পদ এর ছবিগুলি। ছবিকে সব সময়েই ধারাবিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়, এগুলি মূল ধারাবিবরণীরই অঙ্গ।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার সাল-তারিখ। এই বইতে শিক্ষার্থীদের নীরস তাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-বাদশাহের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণতাবে শাসক বংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখো’ দেওয়া আছে, যার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভাব তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। প্রত্যেক অনুশীলনীতে ‘কল্পনা করে লেখো’ অংশে করেকটি কল্পনাক্রিয় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশক্তিকে পরাখ করা। তবে মূল্যায়নের সময় এই অংশের প্রশ্নগুলি রাখা যাবে না।

- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠি ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে)। (বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা আনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই রকম একটি দিকনির্দেশ করা হয়েছে।